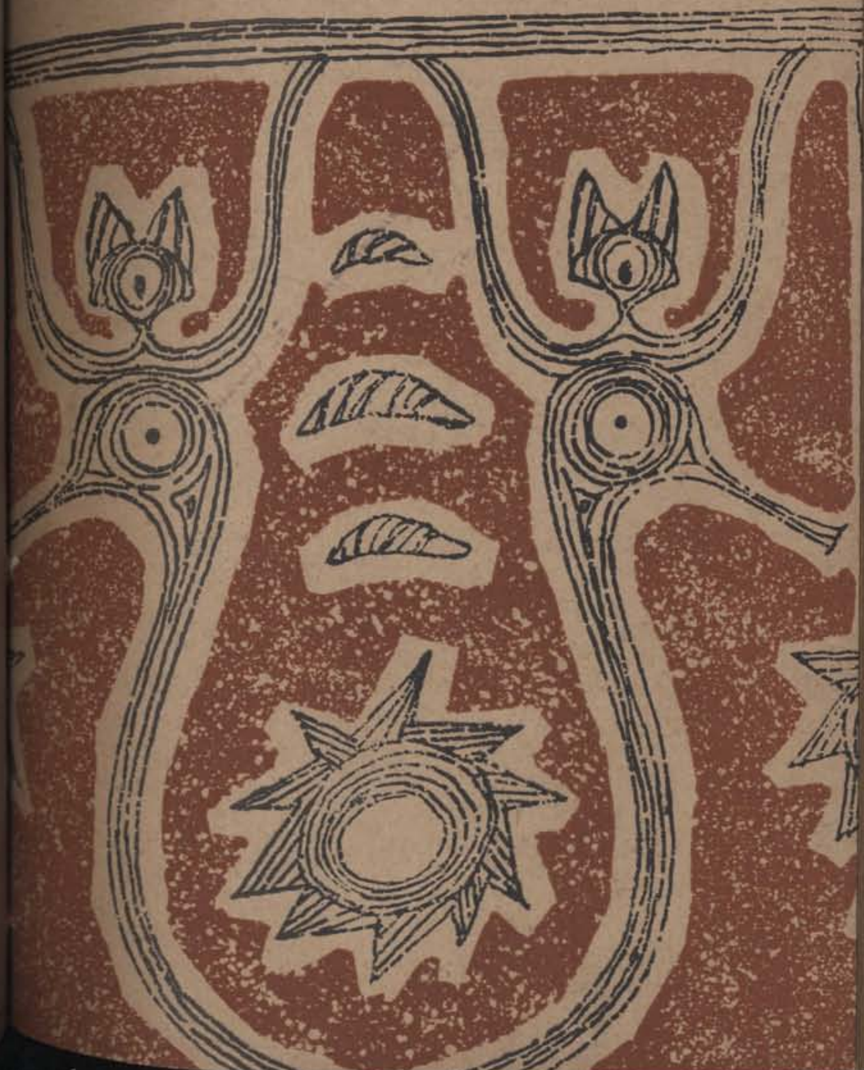
চৈত্র

১৩৬৭

পরিচয়



পয়লা বৈশাখ প্রকাশিত হবে

হায় ছায়াবৃতা

প্যাটি স লুমুম্বার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত

প্রগতিশীল কবিতার সংকলন।

কবিতা লিখছেন

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। অরুণ মিত্র। অরুণাচল বসু। আশিস সান্যাল। কনক মুখোপাধ্যায়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। কৃষ্ণ ধর। গোপাল ভট্টাচার্য। গোলাম কুদ্দুস। চিত্ত ঘোষ। জগন্নাথ চক্রবর্তী।

পলিন লুমুম্বাকে লেখা শে পত্র ও আফ্রিকা প্রসঙ্গে রচিত ঐতিহাসিক কবিতাটির অনুবাদ। পূর্ব-পাকিস্তানের কবিদে নির্বাচিত কবিতাবলী।

তরুণ সান্যাল। তুষা চট্টোপাধ্যায়। ধনঞ্জয় দাশ। দিনেশ দাশ। পবিত্র মুখো-পাধ্যায়। পূর্ণেন্দু পত্রী। পূর্ণেন্দু বিকাশ ভট্টাচার্য। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। বিমলচন্দ্র ঘোষ। বিষ্ণু দে। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মণীন্দ্র রায়। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। রণজিৎ সিংহ। রাম বসু। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শক্তিব্রত ঘোষ। শঙ্খ ঘোষ। শ্যামসুন্দর দে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। সুনীল চট্টোপাধ্যায়। সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সিদ্ধেশ্বর সেন। সৈয়দ আবুল হুদা ও অন্যান্য।

সম্পাদনা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য : এক টাকা

পরিবেশক

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ১২

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংখ্যা

পরিচয়

পঁচিশে বৈশাখের পূর্বে প্রকাশিত হবে

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সংস্কৃতির

বহু বিচিত্র রূপের বিশ্লেষণমূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখছেন :

হিরণকুমার সান্যাল। সরোজ আচার্য। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। নারায়[ণ] গঙ্গোপাধ্যায়। জীবেন্দ্র সিংহরায়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। মণীন্দ্র রায়। রবীন্দ্র মজুমদার। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। দেবেশ রায়। রাম বসু। মতি নন্দী। কার্তিক লাহিড়ী। সুরজিৎ দাশগুপ্ত। চিত্তরঞ্জন ঘোষ। সত্য গুপ্ত। অমল দাশগুপ্ত। পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়। অশ্রুকুমা[র] শিকদার। সুনীল সেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। গোপাল হালদার। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

'পরিচয়'-এর সুদীর্ঘ ঐতিহ্য

অক্ষুণ্ণ রাখার দাবিতে এই সংখ্যা পঁচিশে বৈশাখের

পূর্বে প্রকাশিত হবে

মূল্য দেড় টাকা

বার্ষিক গ্রাহকদের অতিরিক্ত লাগবে না।

এজেন্টরা তৎপর হোন

পরিচয়

১৩৬৭ : ১৮৮৩

সূচীপত্র

সংখ্যা চৈত্র

পঁচিশে বৈশাখ	৮২৩	সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
ওই মুখ	৮৪৪	রণজিৎ সিংহ
শ্মশানযাত্রা	৮৪৫	সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
আর কতকাল	৮৪৬	সুশীলকুমার গুপ্ত
মৃত্যুর পরে : জন্মের মুহূর্তে	৮৪৭	বিকাশ দাশ
বেহালার সুরে রক্তজবা	৮৪৮	কমলেশ সেন
হরিণা তেরি নিলয় না জানি	৮৫০	সাগর চক্রবর্তী
আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্যের কয়েকটি সমস্যা	৮৫১	এল. তিমোফেয়েফ
রবীন্দ্রমানসের স্তম্ভিত উপত্যকা	৮৫৭	শম্ভু মুখোপাধ্যায়
সাম্প্রতিক সাহিত্য	৮৭৫	পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তক-পরিচয়	৮৮১	সুনীল সেন
	৮৮৩	অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
	৮৮৭	বাণিক রায়
পত্রিকা প্রসঙ্গ	৮৯১	রণজিৎ দাশগুপ্ত
	৮৯৫	পবিত্র মুখোপাধ্যায়
পাঠকগোষ্ঠী	৮৯৭	সুরজিৎ দাশগুপ্ত
সংস্কৃতি-সংবাদ	৯০৩	অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র
	৯১০	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	৯১১	রবীন্দ্র মজুমদার

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়

৩০ বর্ষ; ৯ম সংখ্যা
চৈত্র, ১৮৮৩ ; ১৩৬৭

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্র-রচনা সংকলন ও গ্রন্থন

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

এমন অনেক রবীন্দ্র-অনুরাগী সংঘ ও প্রতিষ্ঠান আছে, ঘটা করে উৎসব পালনের সংগতি ও আয়োজন যাদের নেই অথচ কবিকে শ্রদ্ধা জানানোর আন্তরিক আগ্রহ আছে। প্রধানত, তাদেরই জন্য এই অনুষ্ঠানসূচীর পরিকল্পনা। অনুষ্ঠানের দুতিন ঘণ্টা পরিসরে কবি-জীবনের এমন একটি ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, যা ছোট হলেও, আশা করি, কবিকে ছোট করে নি কিংবা মানুষ রবীন্দ্রনাথকে হারিয়ে ফেলে নি।

কবি-জীবনের ধারাকে মুখ্যত সাতটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে : ক। প্রকৃতি ও কবি। খ। কবি ও বিশ্বমানব। গ। কবি ও সমাজ। ঘ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও কবি। ঙ। সাম্রাজ্যবাদ ও কবি। চ। ভারতের জাতীয় সংগ্রামে কবি। ছ। সভ্যতার সংকটে কবি।

যদিও সাতটি পর্যায়ে কবি জীবনের এই পরিক্রমা কল্পিত, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় কবির পরবর্তী জীবন বিকাশে পৃষ্ঠপটের মত। এইটিই কবির মূল সুর, এই সুর তাঁর সমস্ত জীবনে পরিব্যাপ্ত। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিরুদ্ধতায় প্রতিহত হয়ে এই সুরই কখনো ব্যথিত, কখনো ক্রুদ্ধ।

বিভিন্ন পর্যায়ে কবির বক্তব্য তাঁর নানাকালিক রচনা থেকে আহৃত হয়েছে। যে সূত্রটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে কবি-জীবনের বিকাশ, ব্যক্তি-জীবনের নয়। তাছাড়া অনুষ্ঠানগত সংগতি ও নাটকীয়তার জন্য রচনাগুলির কালক্রমিক সন্নিবেশ সম্ভব নয়।

এই অনুষ্ঠান অনুধাবন ও পালন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ক, ক১, খ, গ ইত্যাদি চিহ্নিত স্থানে দেওয়া হল। নির্দেশে ব্যবহৃত সংকেতগুলির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

সূত্রনির্দেশ। সঞ্চ। পঁচিশে বৈশাখ। ৬৮৮ = সঞ্চয়িতা (১৩৬৫ সং), 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতা, ৬৮৮ পৃষ্ঠা।

স্বর ৩ = স্বরবিতান তৃতীয় খণ্ড।

গীবি। ১৪০ = গীতবিতান (১৩৬৪ সং) ১৪০ পৃষ্ঠা।

বি-প্র = বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩৪৮ সং)।

আত্ম=আত্ম পরিচয় (১৩৫২ সং) ।

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ=শ্রীঅমল হোম প্রণীত উক্ত পুস্তক।

১ রচ। প্রভাত উৎসব। ৬২=১ম খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী, 'প্রভাত উৎসব' কবিতা, ৬২ পৃষ্ঠা (সংস্করণ ভেদে রচনাবলী পৃষ্ঠাঙ্কের পরিবর্তন হয় বলে সংস্করণ বা বৎসর উল্লেখ করা হল না। সংস্করণ বিশ্বভারতীর ।)

॥ অনুষ্ঠান নির্দেশ ॥ 'ক', 'খ', 'গ' ইত্যাদি দ্বারা কবি-জীবনের পর্যায় ভাগ করা হয়েছে। 'ক১', 'সূত্র ক২'='ক' পর্যায়ভুক্ত বিভিন্ন স্তরের সূত্র। ক১/ক ক১/খ... সূত্র পাঠের পর পর্যায়ক্রমে এই অংশগুলি নির্দেশ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। একমাত্র 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি চিহ্ন বহির্ভূত। এই কবিতাটি দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়কে গাঁথা হয়েছে।

আবৃ।=একক পুরুষ কণ্ঠে আবৃত্তি।

আবৃ। সম।=একাধিক পুরুষ কণ্ঠে আবৃত্তি।

আবৃ। নারী।=একক নারী কণ্ঠে আবৃত্তি।

আবৃ। দ্বৈত।=এক পুরুষ ও এক নারী কণ্ঠে আবৃত্তি।

আবৃ। মিলি।=একাধিক পুরুষ ও একাধিক নারী কণ্ঠে আবৃত্তি।

গান।=একক পুরুষ বা নারী কণ্ঠে গান।

গান। মিলি।=একাধিক পুরুষ বা নারী কণ্ঠে গান।

গান। মৃদু ক৪ক।=ক৪ক পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলাকালীন নেপথ্যে গানটি এক মৃদু কণ্ঠে গাওয়া হবে।

সুর। মৃদু গ৩খ।=গ৩খ পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলাকালীন নেপথ্যে গানের সুর মৃদুভাবে বাজবে।

গান। মিলি। সুর ঙ৩খ=মিলিত কণ্ঠে গানটি হবার পর সুরে সে ঙ৩খ অনুষ্ঠান পর্যন্ত চলবে।

'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতার বিভিন্ন অংশগুলি এক কণ্ঠে ও সূত্রগুলি আরেক কণ্ঠে পঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। * চিহ্নিত অংশগুলি সময়াভাবে অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

উদ্বোধন

সুর। মৃদু ক।—স্বর ৩০

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি

আবৃ।—সঞ্চ। পঁচিশে বৈশাখ। ৬৮৮

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে…একখানা মালা।

প্রকৃতি ও কবি

॥ ক ॥ গান। মিলি।—স্বর ৩০

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি

॥ সূত্র ক১ ॥ আত্ম।

যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই; মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি শান্তম্, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যম্।

॥ ক১ক ॥ গান।—স্বর ৩০

আকাশভরা সূর্যতারা…লেগেছে তার টান

॥ ক১খ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। প্রভাত উৎসব। ৩৮

হৃদয় আজি মোর…করিছে কোলাকুলি।

॥ ক১গ ॥ আবৃ। মিলি।—১ রচ। প্রভাত উৎসব। ৬৩

তরুণ আলো দেখে…তটিনী বয়ে যায়।

॥ ক১ঘ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। প্রবাসী। ৪৬৬

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে…সবাই আমারে টানিছে।

॥ ক১ঙ ॥ আবৃ। নারী।—সঞ্চ। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। ৩৭

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া…দিবরে পরাণ ঢালি।

*॥ ক১চ ॥ আবৃ।—১ রচ। স্রোত। ৯৩

তপন ভাসে, তারা ভাসে…তারার সাথে যাই।

সবার সাথে আছি…ভাসিয়া চলে যাই।

॥ ক১ছ ॥ আবৃ।—১ রচ। প্রভাত উৎসব। ৬৪

ওঠো হে ওঠো রবি…আমারে লও তবে

॥ ক১জ ॥ গান। মিলি।—স্বর ১৬

আলোকেরই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও

*॥ ক১ঝ ॥ গান। মৃদু ক৪।—স্বর ৪১

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে

॥ সূত্র ক¹ ॥ ১ রচ। সূচনা—প্রভাত সঙ্গীত।

যে ভাবে তখন আমায় আবিষ্ট করেছিল সেটা হচ্ছে এই ... সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই কোন একটা কেন্দ্রস্থলে ... পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে ... হয়ে রূপ হয়ে ধ্বনি হয়ে।

॥ ক¹ক ॥ গান।—স্বর ১৬

আকাশ হতে আকাশ পথে

॥ সূত্র ক³ ॥ ১৫ রচ। শান্তিনিকেতন।

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন ... হউক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হউক, কোন জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারিদিকেই গতি এবং স্ফূর্তি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই অপ্রমত্ততা।

॥ ক³ক ॥ আবৃ। দ্বৈত।—সঞ্চ। উদ্‌বোধন। ৬১৮

নৃত্যলীলা জড়ের শিলা···সে তো ছায়ার ছায়া

॥ ক³খ ॥ নাচ। গান।—স্বর ২

নৃত্যের তালে তালে

॥ সূত্র ক³ ॥ বি-প্র। চিঠির টুকরি।

আজ সকালে বিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্য দিয়ে চমৎকার সূর্যালো... হয়েছিল; ঈষৎ বাষ্পাবিষ্ট তার সকরুণ আলো এখানকার গাছপালা বাড়ীঘর যা কিছু স্পর্শ করেছিল তার থেকেই ... অসীমের সুর বাজিয়ে তুললে। এই হচ্ছে চিরপরিপূর্ণতার সুর। আমি এখান থেকে আমার জীবনের মন্ত্র নিতে চাই।

॥ ক⁴ক ॥ আবৃ।—১৪ রচ। প্রভাত। ১০৩

স্বর্ণসুধা ঢালা এই···সৌরভের স্রোতে।

॥ ক⁴খ ॥ গান। মিলি।—স্বর ৫

সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা

কবি ও বিশ্বমানব

আবৃ।—সঞ্চ। পঁচিশে বৈশাখ ৬৯০

পঁচিশে বৈশাখ তারপরে দেখা···অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে ...

॥ সূত্র খ¹ ॥ আত্ম।

বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সেদিক থেকে কোন চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতে আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কিছুতেই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড় মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড় আমির সঙ্গে আমরা মিলতে চাই।

॥ খ¹ক ॥ আবৃ। দ্বৈত।—সঞ্চ। প্রাণ। ৪২

মরিতে চাহি না আমি···আমি বাঁচিবারে চাই।

॥ খ¹খ ॥ আবৃ। নারী।—১২ রচ। বলাকা। ৪৬

কত যে যুগ যুগান্তরের পুণ্যে···আনন্দে সে আমারে তাই চায়।

॥ খ¹গ ॥ গান।—স্বর ১৫

আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে

॥ সূত্র খ² ॥ ১৫ রচ। শান্তিনিকেতন।

এই আমি টুকুর টান কত সূর্যের আলোয় বাজছে, কত লোকে লোকে দুঃখ মরণের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্ছে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয়রূপে বিচিত্র হয়ে উঠছে। সকল আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট বীণায় এই আমি এবং আমার মত এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝংকৃত হয়ে উঠছে। কী সুন্দর আমি, কী মহৎ আমি! কী সার্থক আমি!

॥ খ²ক ॥ আবৃ।—সঞ্চ। প্রাণ। ৪৩৬

এ আমার শরীরের শিরায়···নাড়ীতে আজ করিছে নর্তন।

॥ খ²খ ॥ গান।—স্বর ৪১

তার অন্ত নাই গো

॥ সূত্র খ³ ॥ সঞ্চ। গ্রন্থপরিচয়।

এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। সেই

ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহ চাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক ...
দেখিয়া আমি একটা মহা সৌন্দর্য নৃত্যের আভাষ পাইতাম।

॥ খ৩ক ॥ আবৃ।—সঞ্চ। বসুন্ধরা। ১৯১, ১৯২

ইচ্ছা করে মনে মনে…হেন ইচ্ছা করে।

॥ খ৩খ ॥ আবৃ।—৫ রচ। ভাষা ও ছন্দ। ৯৬

মহাম্বুধি যেইমত ধ্বনিহীন…মহৎ মর্যাদা করি দান।

॥ সূত্র খ৪ ॥ আত্ম।

নিজের প্রবাহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে ...
দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের ...
দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখ...
পাই।

॥ খ৪ক ॥ আবৃ।—১০ রচ। উৎসর্গ। ৩৬

বাহির হইতে দেখো না…উদার মন্ত্রে মাতিয়া।

॥ খ৪খ ॥ গান।—স্বর ৫

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে।

কবি ও সমাজ

স্বর। মৃদু গ।—স্বর ৫

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী

আবৃ।—সঞ্চ। পঁচিশে বৈশাখ। ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪

সেদিন পঁচিশে বৈশাখ…তরঙ্গ মন্দ্রিত জনসমুদ্র তীরে।
সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে…পড়েছে রক্তধারা।
বিদ্বেষে অনুরাগে…জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে।

॥ গ ॥ গান (প্রথম দুই কলি)। মিলি। স্বর গ৩গ।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী

*॥ সূত্র গ১ ॥ আত্ম।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধা...
ভেদ করে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন। এখন ...
নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।

*॥ গ১ক ॥ আবৃ।—৮ রচ। নৈবেদ্য। ৪০, ৪১

বাজায়েছি বাঁশী…কোন দুঃখ নাহি।

॥ গ১খ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। এবার ফিরাও মোরে। ২২০

এবার ফিরাও মোরে…রেখো না বসায়ে আর।

॥ গ১গ ॥ আবৃ। নারী।—সঞ্চ। দুঃসময়। ২৯৩, ২৯৪

এ নহে মুখর বনমর্মর…কোথা আশ্রয় শাখা…পাখা।

॥ গ১ঘ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। দীক্ষা। ৪৪০

আঘাত সংঘাত মাঝে…রণগুরু।

॥ সূত্র গ২ ॥ আত্ম।

অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল।

*॥ গ২ক ॥ গান (মাঝের দুই কলি)। মিলি। স্বর গ৩গ।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী।

॥ গ২খ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। আহ্বান। ৫৯৭

মহেন্দ্রের বজ্র হতে…সব লও লুটে।

॥ গ২গ ॥ আবৃ। দ্বৈত।—সঞ্চ। আগমন। ৪৯২

ওরে দুয়ার খুলে দেরে…দুঃখরাতের রাজা।

*॥ গ২ঘ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। বর্ষশেষ। ৩২২

রথচক্র ঘর্ঘরিয়া…জয় তব জয়।

*॥ সূত্র গ৩ ॥ আত্ম।

শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে বাদ দিয়ে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সত্য নয়।

॥ গ৩ক ॥ আবৃ। নারী।—গীবি। ১৪৭

অন্ধকারের উৎস হতে…সেই তো তোমার স্নেহ।

॥ গ৩খ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। অশেষ। ৩১৬

রাত্রি মোর, শান্তি মোর…কী করিব কাজ!

॥ গ°গ ॥ গান। মিলি।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী

॥ সূত্র গ° ॥ ১১ রচ। গ্রন্থপরিচয়।

দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে। সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এদেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে। সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না।

॥ গ°ক ॥ আবৃ। নারী।—সঞ্চ। এবার ফিরাও মোরে। ২১৯

কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে···রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

॥ গ°খ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। দুঃসময়। ২৯৪

বহুদূর তীরে কারা ডাকে···মিনতিমাখা···পাখা।

॥ গ°গ ॥ আবৃ। দ্বৈত নারী।—সঞ্চ। এবার ফিরাও মোরে। ২২০

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা···বন্ধ অন্ধকার।

॥ গ°ঘ ॥ আবৃ। সম।—সঞ্চ। এবার ফিরাও মোরে। ২২০

অন্ন চাই, প্রাণ চাই···সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

॥ সূত্র গ° ॥ ৬ রচ। গোরা।

সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ—ভয় যে কত তার ঠিকানা নেই। জগতে সত্যের সঙ্গে কি রকম পৌরুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা এরা জানবে কী করে। আর তুমি আমি মনে করছি যে আমরা যখন দুপাতা বিজ্ঞান পড়েছি তখন আমরা আর এদের দলে নেই। কিন্তু একথা নিশ্চয় জেনো চারিদিকের হীনতার আকর্ষণ থেকে অল্প লোক কখনই নিজেকে বই পড়া বিদ্যার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এরা যতদিন পর্যন্ত জগদ্‌ব্যাপারের মধ্যে নিয়মের আধিপত্যকে বিশ্বাস না করবে, যতদিন পর্যন্ত মিথ্যা ভয়ের দ্বারা জড়িত হয়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত লোকেরাও এ প্রভাব ছাড়াতে পারবে না

॥ গ°ক ॥ আবৃ। নারী।—৮ রচ। নৈবেদ্য। ৫৬

ওরে মৌন মূক কেন···তোর সঙ্গীতের নবতান

॥ গ°খ ॥ গান।—তপতী।

জাগো আলস শয়ন বিলগ্ন

॥ গ°গ ॥ সুর। মৃদু গ°।—স্বর ১২

সর্ব খর্বতারে দহে

॥ সূত্র গ° ॥ ১১ রচ। স্বদেশ।

সাধারণ পৃথিবীর স্পর্শ সযত্নে পরিহার করে মহামান্য আপনাটিকে সর্বদা ধুয়ে মেজে ঢেকে ঢুকে অন্য সমস্তকে ইতর আখ্যা দিয়ে ঘৃণা করে আমরা যেরকম ভাবে চলেছিলুম তাকে আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা বলে। এই রকম অতিবিলাসিতায় মনুষ্যত্ব ক্রমে অকর্মণ্য ও বন্ধ্যা হয়ে আসে।

॥ গ°ক ॥ আবৃ। মিলি। (স্তোত্রের সুরে)—সঞ্চ। অপমানিত। ৫০৯, ৫১০

হে মোর দুর্ভাগা দেশ···দাও নাই স্থান···তাহাদের সবার সমান

আবৃ। সম নারী।

যারে তুমি নিচে ফেল···গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।

আবৃ। মিলি।

অপমানে হতে হবে···সবার সমান

আবৃ। সম।

দেখিতে পাওনা তুমি···আপনারে বেঁধে রাখ···অভিমান।

আবৃ। মিলি।

মৃত্যুমাঝে হবে তবে···সবার সমান।

॥ গ°খ ॥ নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (নির্বাচিত দৃশ্য)

॥ গ°গ ॥ আবৃ।—২০ রচ। পত্রপুট। ৪৫, ৪৬

দলের উপেক্ষিত···পাহারা নেই।

মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি···আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

॥ সূত্র গ° ॥ ৬ রচ। গোরা।

আমরা যেমন চাষাকে কেবলমাত্র চাষবাস, তাঁতিকে তার কাপড়

তৈরির মধ্যে দেখি বলে তাদের ছোটলোক বলে অবজ্ঞা করি, তারা সম্পূর্ণভাবে আমাদের চোখে পড়ে না এবং ছোটলোক-ভদ্রলোকের সেই বিচ্ছেদের দ্বারাই দেশ দুর্বল হয়েছে, ঠিক সেইরকম কারণেই দেশের মেয়েদের কেবল তাদের রান্নাবান্না বাটনা-বাটার মধ্যে আবদ্ধ করে দেখছি বলেই মেয়েদের মেয়েমানুষ বলে অত্যন্ত খাটো করে দেখি। এতে করে আমাদের সমস্ত দেশই খাটো হয়ে গেছে।

॥ গ^{৭}ক ॥ আবৃ। নারী।—সঞ্চ। মুক্তি। ৫৫৬, ৫৫৪

এ সংসারে এসেছিলেম ন বছরের…বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।

॥ সূত্র গ^{৮} ॥ ২৪ রচ। কালান্তর।

নবযুগের আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহুযুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী।

॥ গ^{৮}ক ॥ আবৃ। নারী।—সঞ্চ। সবলা। ৬৩১, ৬৩২

নারীকে আপন ভাগ্য…প্রাণ করি পণ।

হে বিধাতা, আমারে রেখো না…নির্বারিত স্রোতে।

॥ গ^{৯} ॥ আবৃ। দ্বৈত।—৮ রচ। নৈবেদ্য। ৫০

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে…আনন্দে উদার উচ্চ।

॥ গ^{৯}ক ॥ গান। মিলি।

সর্ব খর্বতারে দহে

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও কবি

স্বর। মুহূ ঘ^{১}।—স্বর ৪৬

বাঙলা দেশের হৃদয় হতে

॥ সূত্র ঘ ॥ ১০ রচ। সমূহ।

কিছুকাল হইতেই আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে—

আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।

বুঝিতেছিলাম বটে, কিন্তু এই অখণ্ড ঐক্যের মূর্তিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মত দেখিতে পাইতেছিলাম না। এইভাবে আরও অনেকদিন চলিত। এমন সময় লর্ড কার্জন যবনিকার উপর এমন একটা প্রবল টান মারিলেন যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোন আবরণ রহিল না।

বাংলা যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—

॥ ঘ^{১}ক ॥ আবৃ। মিলি।

আমরা যে বাঙালী, আমরা যে এক।

॥ সূত্র ঘ^{২} ॥ ৪ রচ। ভারতবর্ষ।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষ্যস্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালীর হৃদয়ে এক আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম, বহু কোটি বাঙালীর সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে।

॥ ঘ^{২}ক ॥ গান। মিলি।

বাঙলা দেশের হৃদয় হতে

॥ ঘ^{২}খ ॥ আবৃ।—৮ রচ। নৈবেদ্য। ৫৮

আমি ভালোবাসি দেব…সব ছেড়ে যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

*॥ ঘ^{২}গ ॥ গান।—স্বর ৪৬

সার্থক জনম আমার

॥ ঘ^{২}ঘ ॥ স্বর। মুহূ ঘ^{৩}—স্বর ৪৬

বাঙলার মাটি বাঙলার জল।

সূত্র ঘ^{৩} ॥ ৪ রচ। ভারতবর্ষ।

যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ

করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণ ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলা দেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও। আজ বাঙলা দেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দেমাতরম গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আরেক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক।

*॥ ঘ°ক ॥ গান। মিলি।

বাঙলার মাটি বাঙলার জল

*॥ সূত্র ঘ° ॥ ৪ রচ। ভারতবর্ষ।

আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। যে পথ কঠিন যে পথ কণ্টকসঙ্কুল সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিও না, ফিরিও না। দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিও না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে। দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

*॥ ঘ়ক ॥ আবৃ।—সঞ্চ। দান। ৪৯৩

আজকে হতে জগৎ মাঝে…আমি ছাড়ব সকল ভয়।

*॥ ঘ°থ ॥ আবৃ। মিলি।—১২ রচ। বলাকা। ৫

আমরা চলি সমুখপানে…কাঁদবে কেবল কাঁদবে।

*॥ঘ°গ ॥ গান। মিলি।—স্বর ৪৭

আমাদের যাত্রা হল শুরু।

॥ সূত্র ঘ° ॥ ১০ রচ। সমূহ।

এতবড়ো চাকরিপিপাসু বাঙলা দেশেও এমন একটা দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাঁত

চালাইবার জন্য তাঁতির কাছে শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল, ভদ্রঘরের ছেলে নিজের মাথায় কাপড়ের মোট তুলিয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা গৌরবের কাজ বলিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিল। আমাদের সমাজে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই।

॥ ঘ°ক ॥ গান। মিলি।—স্বর ৪৩

আমার সোনার বাঙলা

সাম্রাজ্যবাদ ও কবি

সুর। মৃদু ঙ°ক।—স্বর ১

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী

॥ সূত্র ঙ° ॥ ১৯ রচ। যাত্রী।

বর্তমান সভ্যতায় রুচির সঙ্গে কৌশলের যে বিচ্ছেদ চারিদিক থেকেই দেখতে পাই, তার একমাত্র কারণ, লোভটাই তার অন্য সকল সাধনাকে ছাড়িয়ে লম্বোদর হয়ে উঠেছে। বস্তুর সংখ্যাধিক্য বিস্তারের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সুন্দরকে সে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না। সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যলোভের এই বিরোধে মানবধর্মের মধ্যে যে আত্মবিপ্লব ঘটে তাতে দাসেরই যদি জয় হয়, পেটুকতার যদি আধিপত্য বাড়ে, তা হলে যম আপন সশস্ত্র দূত পাঠাতে দেরী করবে না।

॥ ঙ°ক ॥ আবৃ।—৮ রচ। নৈবেদ্য। ৫২

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে…নিখিলের বিরাট বিধান।

॥ সূত্র ঙ° ॥ ৪ রচ। ভারতবর্ষ।

এক সময় ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় জোগাইয়াছে। আজ সে পরের কাপড় পরিয়া লজ্জা বাড়াইতেছে। এক সময় ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল, আজ হাদে লক্ষী হইল লক্ষ্মী ছাড়া। এক সময়ে ভারতে পৌরুষ রক্ষা করিবার অস্ত্র ছিল, আজ কেবল কেরানীগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। রোমের শাসনে, স্পেনের শাসনে, মোগলের শাসনে এত বড় একটা বৃহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায় বিহীন হইয়াছে? অনেক দিন ধরিয়া

চোখ বুজিয়া আমরা বিলাতি সভ্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, সে-সভ্যতা স্বার্থকে অভিভূত করিয়া বিশ্বহিতৈষা ও বিশ্বজনের শৃংখলমুক্তির পথে সত্যপ্রেম-শান্তির অনুকূলে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ চমক ভাঙিবার সময় আসিয়াছে। সমস্ত ইউরোপ আজ অস্ত্রে অস্ত্রে দন্তুর হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসায় বুদ্ধি তাহার ধর্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতেছে। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় পাখী যেমন আপন নীড়ের দিকে ছোটে তেমনই বায়ুকোণে রক্তমেঘ দেখিয়া পূর্বদেশ হঠাৎ আপনার নীড়ের সন্ধানে উড়িবার উপক্রম করিয়াছে।

॥ ঙ২ক ॥ আবৃ।—৮ রচ। নৈবেদ্য। ৫২

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত···ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।

॥ ঙ২খ ॥ গান। মৃদু ঙ২ক।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী

॥ স্থত্র ঙ৩ ॥ ১৬ রচ। শান্তিনিকেতন।

এই মুহূর্তে সমুদ্রের পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী নিদারুণ যুদ্ধ চলেছে। সেখানে আজ এই প্রভাতের আলোক কী দেখেছে—কী প্রলয়ের বিভীষিকা।

॥ ঙ৩ক ॥ আবৃ।—১২ রচ। বলাকা। ৬০

বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ···আর চলিবে না।

॥ স্থত্র ঙ৪ ॥ ১৬ রচ। শান্তিনিকেতন।

এই বিভীষিকার উপর দাঁড়িয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে প্রচার করছে, সেখানে ইতিহাসের ডাক এসেছে। সেই ডাক শুনে সবাই বেরিয়ে পড়েছে।

॥ ঙ৪ক ॥ আবৃ। নারী।—১২ রচ। বলাকা। ৬১

বাহিরিয়া এল কারা ?···আরামের শয্যাতল।

॥ ঙ৪খ ॥ আবৃ। মিলি।—১২ রচ। বলাকা। ৬১

যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রীদল।

॥ ঙ৪গ ॥ গান। মৃদু ঙ৪ঘ।—তপতী।

জাগো হে রুদ্র জাগো।

॥ ঙ৪ঘ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। বর্ষশেষ। ৩২৩

হে কুমার হাস্যমুখে···অর্পিব পরাণ।

॥ ঙ৪ঙ ॥ আবৃ।—১২ রচ। বলাকা। ৭৫, ৭৬

চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার···এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

*॥ স্থত্র ঙ৫ ॥ ১৬ রচ। শান্তিনিকেতন।

কোন জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে—তা হবে না, ইতিহাস বিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় দানবের পায়ে এতদিন ধরে নরবলির উদ্যোগ করেছে। আজ তাই সেই নরদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে।

*॥ ঙ৫ক ॥ আবৃ।—১২ রচ। বলাকা। ৬২, ৬৩

এ আমার এ তোমার পাপ···নিখিলের যত বজ্রবান।

॥ স্থত্র ঙ৬ ॥ ১৬ রচ। শান্তিনিকেতন।

আজ জগৎজুড়ে যে ক্রন্দন বেজেছে, তার মধ্যে ভয়ের সুর নেই, তার ভিতর দিয়ে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে, তারই মধ্যে ইতিহাস বিধাতার আনন্দ। সে-ক্রন্দন তার মধ্যে শান্ত। সেই শান্তম্ শিবমদ্বৈতমের মধ্যে মৃত্যু মরছে।

॥ ঙ৬ক ॥ আবৃ। নারী।—সঞ্চ। গান্ধারীর আবেদন। ৩৮১

যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে···ওই শুনা যায়।

॥ ঙ৬খ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। মরণমিলন। ৪৭৩, ৪৭৪

আমি যাব, যেথা তব তরী রয়···সেই মহাবরষার রাঙাজল··· হে মোর মরণ।

*॥ ঙ৬গ ॥ আবৃ। সম-নারী।—১২ রচ। গীতাঞ্জলি।

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।

*॥ ঙ৬ঘ ॥ আবৃ। সম।—গীবি। ৯১

মরতে মরতে মরণটারে···আপন আসন আপনি লবে।

॥ ঙ৬ঙ ॥ গান। মিলি।

জাগো হে রুদ্র জাগো

*॥ সূত্র ঙ১ ॥ ১২ রচ। গ্রন্থপরিচয়।

যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার স্বরূপ। ... লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একটা সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ ... করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণের পর্ব এখনও আরম্ভ হয়নি। আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে ... ঘরছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে।

ভারতের জাতীয় সংগ্রামে কবি

গান। মিলি। মুদ্র চ১ক।

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে

॥ সূত্র চ১ ॥ ২৪ রচ। কালান্তর।

বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরও অনেক বড়ো। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। ভারতের আজকের এই উদ্বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগান্তরের দ্বার খুলেছে।

॥ চ১ক ॥ আবৃ।—সঞ্চ। সুপ্রভাত। ৪৮১

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি…দীপ্ত গগন মাঝে রে

*॥ চ১খ ॥ আবৃ। মিলি (স্তোত্রের সুরে)।—সঞ্চ। সুপ্রভাত। ৪৮২

উদয়ের পথে শুনি কার…ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

॥ সূত্র চ২ ॥ ২৪ রচ। কালান্তর।

আজ এই বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের প্রভাতে সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে।

॥ চ২ক ॥ আবৃ। মিলি (বিলম্বিত)।—সঞ্চ। ভারততীর্থ। ৫০৬

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে…হেথায় নিত্য…ধরিত্রীরে…সাগরতীরে।

॥ চ২খ ॥ গান। মিলি।

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে

॥ সূত্র চ৩ ॥ ১৮ রচ। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন।

যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু। সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন।

*॥ চ৩ক ॥ আবৃ।—সঞ্চ। বর্ষশেষ। ৩২২

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত…প্রণমি তোমারে।

॥ চ৩খ ॥ গান। মিলি।—স্বর ৫৬

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা

॥ সূত্র চ৪ ॥ ১০ রচ। রাজাপ্রজা।

অক্ষম যখন অস্থিমজ্জায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবধর্মের আর কোন উচ্চতর দাবি তাহার কাছে কোনমতেই রুচিতে চাহে না, তখন কেবল ইংরেজের রক্তচক্ষু পিনালকোড্‌ই ভারতবর্ষে শান্তিবর্ষণ করিতে পারে, এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাড়ে দেন নাই। ইংরেজ জেলে দিতে পারে, ফাঁসি দিতে পারে, কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তারপরেই পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে না। যেখানে জলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদণ্ডকে যদি বিশ্ববিধানের চেয়ে বড়ো বলিয়া জ্ঞান করে, তবে সেই ভয়ঙ্কর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোঝা স্তূপীকৃত হইয়া একদিন সেই ঘোরতর অসামাঞ্জস্য একটা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়াই থাকিতে পারে না।

॥ চ৪ক ॥ আবৃ।—১৪ রচ। 'চিঠি'। ১৩৪

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে…জুঁই ফুলের এই গান।

॥ চ৪খ ॥ গান।—স্বর ৪৬

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি

*॥ সূত্র চ৫ ॥ ২৪ রচ। কালান্তর।

বিনা বিচারে শতশত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে একখানি ছোটো চিঠি লিখিয়াছিলাম। সভ্যতার একটা দায়িত্ব আছে, সকল সংকটেই সে দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে

হইবে। শাস্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণতা অনিবার্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়বিচার প্রণালীর ফিলটারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও পক্ষপাত পরিশূন্য করিয়া সভ্য সমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে। তাহা না হইলেই লাঠিয়ালের লাঠি এবং শাসনকর্তার ন্যায়দণ্ডের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

•॥ চ°ক ॥ আবৃ।—১৫ রচ। বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি। ১৯৪

নিশীথেরে লজ্জা দিল···মুক্তের কে দিল পরিচয়।

•॥ সূত্র চ° ॥ ২৪ রচ। কালান্তর।

হিজলী কারার যে রক্ষীরা সেখানকার দুজন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের প্রতি কোনো একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র খৃস্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে, নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের পরে এত বেশী অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসংগত স্থৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এই সব অত্যন্ত চড়ানাড়ীওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে। এদের বাসা আরামের। আহার বিহার স্বাস্থ্যকর। এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই সব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্টকালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে। যারা বিধিব্যবস্থার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েও বিধিব্যবস্থাকে স্পর্ধিত আস্ফালনের সঙ্গে ছারখার করে দিল, যদি সুকুমার স্নায়ুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদেরই জন্যে একটা স্বতন্ত্র আদর্শের বিচারপদ্ধতি মঞ্জুর হতে পারে, তবে সভ্যজগতের সর্বত্র ন্যায়বিচারের যে মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে তাকে অপমানিত করা হবে এবং সর্বসাধারণের মনে এর যে ফল ফলবে তা অজস্র রাজদ্রোহপ্রচারের দ্বারাও সম্ভব হবে না।

•॥ চ°ক ॥ আবৃ। কবিকণ্ঠ।—সঞ্চ। প্রশ্ন। ৬৩৯

•॥ চ°খ ॥ গান।—স্বর ৪২

বাধা দিলে বাধবে লড়াই।

॥ সূত্র চ' ॥ ১০ রচ। রাজাপ্রজা।

দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই।

॥ চ'ক ॥ আবৃ।—সঞ্চ। নমস্কার। ৪৮৫

শান্তি? শান্তি তার তরে···রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে।

॥ চ'খ ॥ আবৃ।—'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ'। Letter to Lord Chelmsford.

॥ চ'গ ॥ আবৃ।—১৬ রচ। পয়লা আশ্বিন। ১৪২, ১৪৩

ভয় কোরো না···জাগো আমার মন।

নৈরাশ্যের নশ্বর হতে···মাথা তোমার না হয় যেন নত।

॥ চ'ঘ ॥ গান। মিলি।—স্বর ৪৭

শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।

সভ্যতার সংকটে কবি

গান। মিলি। সুর ছ°গ—স্বর ২৫

প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কি দুর্দিন

॥ সূত্র ছ' ॥ ২৬ রচ। সভ্যতার সংকট। ২৪ রচনা। কালান্তর।

এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কি রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালী যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কীরকম দুঃসহ নরকবাস, সে কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জার্মানি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে, উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হলো না।

এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।

॥ ছ১ক ॥ আবৃ।—২৪ রচ। প্রায়শ্চিত্ত। ৯, ১০

দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল…ফুঁসিছে অগ্নিকণা।

প্রতাপের ভোজে আপনারে…রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।

॥ ছ১খ ॥ আবৃ।—২২ রচ। প্রান্তিক। ১৮, ১৯

দেখিলাম একালের…আকাশেরে করিল অশুচি।

॥ সূত্র ছ২ ॥ ২৪ রচ। কালান্তর। ২২ রচ। পারস্যে

সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে। তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার-লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। কী করে মিলতে হয় জাপান তা শিখল না, কী করে মারতে হয় য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিল।

॥ ছ২ক ॥ আবৃ। সম।—২৪ রচ। বুদ্ধভক্তি। ১১, ১২

সাজিয়েছে ওরা সবে…বুদ্ধের মন্দিরতলে।

তুরী ভেরী বেজে ওঠে…ত্রাসে থরো থরো।

॥ সূত্র ছ৩ ॥ ১৬ রচ। শান্তিনিকেতন।

আজ অপ্রেম ঝঞ্ঝার মধ্যে রক্ত স্রোতের মধ্যে এই বাণী মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। মানবজাতিকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

॥ ছ৩ক ॥ আবৃ।—২২ রচ। প্রান্তিক। ১৯

মহাকাল সিংহাসনে…আপন চিতার ভস্মতলে।

॥ ছ৩খ ॥ আবৃ। নারী।—১৫ রচ। চিরন্তন। ২০৬

নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি…কে বাঁচাবে আপনহানা অন্ধ মানুষে

॥ ছ৩গ ॥ আবৃ।—সঞ্চ। জন্মদিন। ৭৮৮

মানুষের দেবতারে…ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়

॥ সূত্র ছ৪ ॥ ২৪ রচ। কালান্তর।

রক্ত কলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ যে আজ একটা শান্তির উঠেছে, ঊর্ধ্ব আকাশে নির্মল নিঃশব্দতা তার বেসুরকে

দিতে পারছে না। শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্য কে করতে পারে? ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত।

॥ ছ৪ক ॥ আবৃ।—সঞ্চ। জন্মদিন। ৭৮৭

ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী…বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে।

সুর। মৃদু জ।—স্বর ৫৫

ওই মহামানব আসে।

॥ ছ৪খ ॥ আবৃ।—২০ রচ। পত্রপুট। ৩৭, ৩৮

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি…মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

॥ সূত্র জ ॥ ২৬ রচ। সভ্যতার সংকট।

আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি। পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম? ইতিহাসের অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।

॥ জ১ক ॥ গান। মিলি। সুর।

ওই মহামানব আসে।

আবৃ।—সঞ্চ। পঁচিশে বৈশাখ। ৬৯৪

অন্তরে বাহিরে…আমার আশীর্বাদ।

গান। মিলি।

ওই মহামানব আসে।

ওই মুখ

রণজিৎ সিংহ

ওই মুখটি আমি গড়েছি
তোমরা দেখে নাও আমার সমৃদ্ধ দেশ

ওই চোখদুটির মণিপদ্মে দিয়েছি
দিব্য আকাশ
তার জাগরণে তোমরা সূর্যস্নান করো
সুপ্তিতে বিরাজ অরণ্যের মৌনে

তোমরা শোনো একটি হাসি
শোনো শৃঙ্খল ভেঙে গেল দাসত্বের পীড়নের
লগ্নে বাজল অভিযান

তোমরা তাকে নামে জানো
পরিচয়ে যে কোনো এক মেয়ে
আমি জানি আশ্চর্যকে
কেননা এই আমি
ওই দুটি ঠোঁটে বহিয়েছি উজ্জীবন।

শ্মশানযাত্রা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কার অঙ্গ সঙ্গে যাবে, ঐ তো অন্তিম অগ্নিজ্বালা
চোখের নশ্বর অন্তে প্রতীক্ষায় দয়াহীন দোলে।
একদা যে সব প্রশ্নে কিছুদিন দুঃখ ভালবাসি
শিল্পের সম্মত শোভা, আজ শেষ শ্মশানে নিরালা
চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে দেখো দুঃখের দুর্বল কলরোলে।
জ্বলে চিতা চৈতন্যের, জ্বলে চিত্র তিমিরবিনাশী ;
কে ছিলে বুকের নীচে, কে আজ ফুলের নীচে, স্থির
অগভীর অবসানে। ভাবো প্রেম—একদা শরীর।

হে পিতা রক্তের উৎস, হে আদিম গন্ধর্ব বাসনা
জানি না কোথায় শান্তি, জানি না রাত্রির অবকাশে
জন্ম কত দূরে যায়, যেতে পারে নগ্নতার সীমা—
ভাঙে শ্রম, অধিকার ; ভাঙে ছন্দ, দৃশ্যের শোচনা ;
বাঁচে শুধু চিহ্নহীন ভুলে যেতে পারার অভ্যাসে
একমাত্র অনায়াস, কিছু শুদ্ধ ভস্মের গরিমা।

আর কতকাল

সুশীলকুমার গুপ্ত

আর কতকাল বলো ঢেউ দিয়ে নাচাবে আমাকে ?
সভ্যতার হাতে ক'রে দিয়েছ কত না উপহার—
শহরফুলের তোড়া, সেতুমালা, যন্ত্রতন্ত্রসার,
রকেটরহস্যগল্প ; তবু কই পাই খুঁজি যাকে ?
কখনো প্রকৃতি হয়ে মাতিয়েছ রোদের খেলায়,
পাখির গানের হীরা দিয়ে কিনে নিয়েছ গহন
মনের স্তব্ধতা, খুঁড়ে তুলেছ স্মৃতির গুপ্তধন
মেঘের শাবলে, শুধু ঘুরিয়েছ অরণ্যধাঁধায়।

হৃদয় হয়েছে নদী। বলো, বলো কোথায় মোহনা।
তোমার অমৃতউৎসে নিয়ে যাও, ভোরের করাত
কাটুক আঁধারবৃক্ষ, খুঁটে খুঁটে তৃণশস্যকণা
হোক নবগৃহস্থালি, ভরে যাক শূন্যতার হাত।

মৃত্যুর পরে : জন্মের মুহূর্তে

বিকাশ দাশ

স্বপ্নগুলি মরে গিয়ে অন্য-এক দৃশ্যে বেঁচে ওঠে,
মুমূর্ষু পাণ্ডুর আশা ঘন-অন্ধকারে মেলে চোখ।
পরাজিত, হতপ্রাণ ফের সঙ্ঘবদ্ধ হতে জোটে ;
টবে বন্দী গাছ খোঁজে এক মুঠো সূর্যের আলোক !

'আমিও অরণ্য হব, অনন্ত জন্মের অধিকার
দাও'—ম্লান বন্দী হাঁকে—কাঁপে কণ্ঠে মৃদু উত্তেজনা।
অস্থির জীবন-বৃত্ত মগ্ন প্রতিহত বারংবার,
স্ফীতগর্ভে অন্ধকারে দীপ্ত তবু মুক্তির যন্ত্রণা !'

অসংখ্য চক্রান্ত-জোট, দ্বন্দ্ব-দ্বেষ, রক্তাক্ত মৃত্যুর
রাহুগ্রাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে বিষণ্ণ স্মৃতির সাঁকো ধরে
পার হতে কেউ ছাই হয়ে কেউ অস্পষ্ট সুদূর—
অবিরল ছুটে চলে মৃত্যু থেকে জন্মের প্রহরে।

বিধ্বস্ত অরণ্যে তাই চৈত্রের প্রতীক্ষা জেলে রাখি,
উন্মোচিত জানালায় রৌদ্র এসো, হাওয়া এসো—
আলোমুগ্ধ উজ্জ্বল জোনাকি !

বেহালার স্বরে রক্তজবা

কমলেশ সেন

দুনিয়াটা বেয়াদপ ঘোড়ার মতো
ছুটছে, অনবরত ছুটছে
দিন আর রাত্রির তামাম কলিজা
জুড়ে মাছেদের অসংখ্য চোখ, অনেক
স্ফটিক স্তম্ভে বিদ্যুৎপ্রবাহ।

গরাদের শিকে সমুদ্রের গর্জন
গর্জন করতে করতে আছড়িয়ে ভেঙে
টুকরো টুকরো হচ্ছে নক্ষত্র।

ডোরাকাটা ফতুয়ার পকেটে, পকেটে
মুঠোয় মুঠোয় নক্ষত্র
গলে গলে বৃষ্টির মতো নদীর মতো
হাঁটু বেয়ে বেয়ে পায়ের পাতায়
তারপর সমুদ্রে।

অথচ অনন্ত রাত্রির আকাশ ফেটে ফেটে
চৌচির, সূর্যকে ছেনে ছেনে পুতুলের
অবয়ব, পুতুলের মতো নক্ষত্রের
আদল, ভালবাসার আদল।

সমুদ্র, বেহালার স্বরে সমুদ্র
বেহালার ছড়ের টান, ভেঙে ভেঙে
মাটিতে প্লাবন, স্বরের মূর্ছনার
প্লাবন, ভালবাসা দিয়ে
এক মুঠো, মুঠো মুঠো, টকটকে
রক্তজবার আদল,
অগ্নিস্তম্ভের মতো টান টান
পেশীতে উজ্জ্বল পরমায়ু, পুতুলের পরমায়ু।

ডোরাকাটা ফতুয়ার পকেটে, পকেটে
মুঠোয় মুঠোয় নক্ষত্র, তামাম কলিজা জুড়ে
নক্ষত্র, নক্ষত্র বেহালার স্বরে
নক্ষত্র ভেঙে ভেঙে প্লাবন, রক্তজবার প্লাবন।

হরিণা তেরি নিলয় না জানি

সাগর চক্রবর্তী

আমার যৌবন কাঁদে যযাতির অতৃপ্তির দাহে ;
এবং লুব্ধক আমি কোনো এক হরিণী কন্যার
গ্রীবাভঙ্গি দেখে খুঁজি তূণীরের তীক্ষ্ণতম তীর
যে তীরে অব্যর্থ বিদ্ধ অই দুটি হরিণী নয়ন
এবং হরিণী—যার নিলয় না জানি অদ্যাবধি ॥

এখন এ অন্ধকার গঙ্গা কিংবা সরস্বতী হয়ে
আমার শরীর ছোঁয়—ধুয়ে দেয়—এবং চিন্তার
পল্লবিত অবসাদ ঢাকে কার মেঘ মেঘ চুল !
এ কী সেই হরিণীর কাকচক্ষু দিঘির প্রপাত
জন্ম দেয় সমুদ্রের চেতনার নক্ষত্র স্পন্দনে ।

'এখন তৃপ্তই আমি' এই মন্ত্র জপ করে করে
আমার দু চোখে ঘুম···আহ্, ঘুম এবং বেদনা
করুণা, হরিণা তেরি নিলয় না জানি অদ্যাবধি ॥

আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্যের কয়েকটি সমস্যা

এল. তিমোফেয়েফ

আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে তাঁর এক ভাষণে নিকিতা ক্রুশ্চফ বলেছেন : "সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে নব নব সাফল্য অর্জনের অভিযানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ, সমবেত করাই হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্পকলার সর্বোচ্চ সামাজিক ভূমিকা।" শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে জনগণের জীবনের নিবিড় সংযোগ সম্পর্কে ক্রুশ্চফের ঐ উক্তি সোভিয়েত সাহিত্যের আরও অগ্রগতি সাধনের এক প্রেরণা-বাণী।

সোভিয়েত জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ সোভিয়েত সাহিত্য দেশের বীরোচিত কর্মকাণ্ডের অন্তরলোকে প্রবেশের চেষ্টা করে, বৃহত্তর জনগণকে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত করে তোলে। সোভিয়েত সাহিত্য যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায়। আধুনিক শব্দের গভীর অর্থেই সোভিয়েত সাহিত্য আধুনিক।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে : যুগের মর্ম, যুগের ধর্ম কেমন করে ধরা যাবে, কেমন করে প্রকাশ করা যাবে? কোন্ সৃষ্টিকে আমরা সত্যিকার আধুনিক বলতে পারি? নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্বের এই সব প্রশ্ন নিয়ে সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় জোর আলোচনা এখনো চলছে।

এই সব বিচার-বিতর্ক থেকে এই ধারণা হয় যে, সমসাময়িক জীবনের শিল্পসম্মত রূপায়ণ বলতে কেবল আমাদের চারপাশের জীবন থেকে বিষয়বস্তু বেছে নেওয়া বোঝায় না, তার চেয়েও বেশি কিছু। আসল কথা হচ্ছে জীবনের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে সাম্যবাদী দর্শনের দ্বারা পরিশুদ্ধ করে নেওয়া, ঘটনা, চরিত্রচিত্রণ ও প্রতিটি মনস্তাত্ত্বিক খুঁটিনাটিকে সাম্যবাদের দিকে আমাদের জয়যাত্রার বিধিবিধানের উদ্ঘাটনে সহায়ক করে তোলা।

কোনো যুগের বাহ্যিক লক্ষণ বা বহিরঙ্গকে সাহিত্যভাত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশি শক্ত কাজ হচ্ছে আমাদের

কালের মানুষের মনের সঠিক পরিচয় দেওয়া, তার চিন্তা, তার স্বপ্ন, অভিপ্সা, তার নতুন জীবন-বোধকে রূপায়িত করা। এই নতুন মূল্যবোধে তাকে পৌছতে হচ্ছে পুরাতন জীবনের সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন সংঘাতের মধ্য দিয়ে। এই সংগ্রামের রূপদান শিল্পীর অন্যতম মুখ্য কর্তব্য। কবি বা শিল্পী তাঁর নিজের যুগকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চান। সেই সঙ্গে তাঁকে দেখাতে হবে এক উন্নততর, উজ্জলতর ভবিষ্যতের জন্যে আজকের নতুন মানুষের আত্মিক এষণা। এই সাহিত্যকেই বলব যথার্থ আধুনিক সাহিত্য।

বর্তমানের আনুগত্য মানতে গিয়ে সোভিয়েত সাহিত্য অতীতের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে মনে করলে ভুল হবে। মানুষের যুগযুগান্তের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে এক নতুন জীবন, এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। সোভিয়েত বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির এ একটি মূল সূত্র। কিন্তু শিল্পীকে, কবিকে অতীতের মূল্যায়ন করতে হবে বর্তমান বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। অতীতের খারাপকে বর্জন করে অতীতের ভালোকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে এক ঐতিহাসিক মানস পটভূমি। এই কারণেই ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমসাময়িক যুগের মূলনীতির একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে।

বর্তমান যুগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও কারুবৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। এই জয়যাত্রায় সোভিয়েত দেশ সবার আগে। যে জগতে পরমাণুর গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতি যান মহাশূন্য পাড়ি দিচ্ছে, সেখানে—সেই যুগে—সাহিত্যের ভূমিকা কী হবে?

এই প্রশ্ন বিশদ ও ব্যাপক আলোচনার ঝড় তুলেছে। "লিতারেতুর্নায়া গেজেতা", "লিতারেতুরা ই ঝিঝ্ন", "কমসোমলস্কায়া প্রাভদা" ও অন্যান্য আরও সব পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধনিবন্ধ বার হয়েছে। এমন সব পাঠক আছেন, এমনকি এমন কিছু লোকও আছেন, যাঁরা ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন যে, এই মহাশূন্য পরিক্রমার যুগে সাহিত্যের রসাত্মক শব্দের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে এবং 'কাব্যের' স্থান অধিকার করতে চলেছে 'পদার্থবিজ্ঞান'। জনগণ এই ধরনের অভিমত স্বভাবতই অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। এই উক্তি সোভিয়েত সংস্কৃতির মর্মকথার সম্পূর্ণ বিরোধী। বহু প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সমাজের প্রতিনিধিরা জানিয়ে দিয়েছেন, কাব্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ থাকতেই পারে না, কাব্য ও

বিজ্ঞান বরং পরস্পরের পরিপূরক এবং শিল্পসাহিত্যের সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষের সর্বাঙ্গীন ও সুসমঞ্জস বিকাশের কথা ভাবাই যায় না। বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল জয়যাত্রার যুগে কাব্যের ক্রমান্বয় প্রভাব হ্রাস ও "অদৃশ্য হওয়ার" মতবাদ ভ্রান্ত ও অমূলক। তবু এই সব আলোচনা থেকে আমরা লাভবান হয়েছি। লেখকের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কোনো কোনো লেখক যুগের বিস্ময়কর গতি ও ইচ্ছাশক্তির উপযোগী একটি বিশেষ নতুন শৈলী গড়ে তোলার কথা বলেছেন। অভিমতটা অস্পষ্ট। এতে সব কিছু এক ছাঁচে ঢালার প্রবণতা এসে যেতে পারে। বর্তমান সোভিয়েত সাহিত্যে যে বিভিন্ন, বিচিত্র সৃজনী ধারা রয়েছে সেইগুলিকে ছাটো করার, একীকরণ করার বিপদ রয়েছে এই মতবাদের মধ্যে। এই জন্যেই এই মতবাদ জনপ্রিয় হতে পারে নি। ব্যক্তিগত নিজস্ব শৈলীগুলির অফুরন্ত বৈচিত্র্যকে একটি সুনির্দিষ্ট শৈলীর কাঠামোর মধ্যে এনে দাঁড় করানো দূরে থাক, আমরা বরং আরও বৈচিত্র্যের দিকে যাব, জীবনের আরও চিত্রবিচিত্র রূপায়ণের পথেই যাব। রুশ ও বিশ্বসাহিত্যের সুস্থ ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা নিয়ে জীবন-রূপায়ণের শিল্পসম্মত নব নব উপায়ের সন্ধান করাই আমাদের লক্ষ্য, আমাদের আদর্শ। সকল ধারা, সকল রঙ, সমস্ত কাব্যিক অন্বেষণ নিয়ে আমাদের সাহিত্য মুখর, ভাস্বর হয়ে উঠবে।

সোভিয়েত সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক কথা-সাহিত্যের শাখাটিও বেশ জনপ্রিয়। এটা যুগধর্ম, যুগের দাবি। এর মূলে রয়েছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের অপরিসীম অগ্রগতি। এই ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের ভাষায়: "তাবৎ সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যান্য সব শাখার মতো সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক কথা-সাহিত্যের শাখাটিরও শিকড় রয়েছে বাস্তব-জীবনের মধ্যে। কল্পনায় কেবল বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টিরই প্রয়োজন পড়ে না, কাব্যময় স্বপ্নেরও দরকার হয়।"

সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক কথা-সাহিত্য নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়ে গেছে। সেই বিস্তারিত আলোচনার মোদ্দা কথাটা এই: বিষয়বস্তু ও ঘটনা সংস্থান নির্বিশেষে মানুষই কথা ও কাহিনীর মুখ্য বিষয়। সুতরাং বিজ্ঞান বিষয়ক কাল্পনিক কথা-সাহিত্যেও লেখককে চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক চিত্র সামনে তুলে ধরতে হবে, ভাষার দিকে সতর্ক

নজর রাখতে হবে, নৈতিক প্রশ্নগুলিকে বড় করে তুলতে হবে। মনো
জন্য মনোরঞ্জন বা কাল্পনিকতার জন্য কাল্পনিকতা সোভিয়েত পাঠক
কাছে চিত্তাকর্ষকও নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়।

হালে সাহিত্যিক মহলের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে একটি প্রশ্নের উপ
শিল্প-সাহিত্যে জাতীয় রূপের প্রশ্ন। এই কথা সর্বজনবিদিত যে, সোভি
দেশের সকল জাতীয় সাহিত্যেরই একটি অভিন্ন পদ্ধতি আছে। সেই
বাস্তব জীবনের শিল্পসম্মত রূপায়ণের মূলনীতিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই অনুসৃত পদ্ধতির নাম সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতি। বি
জাতি-অধিজাতির বিচিত্র সাহিত্যগুলির এক অখণ্ড উৎস হচ্ছে
ভাবাদর্শগত ও শিল্পধর্মসম্মত ভিত্তিভূমি।

জাতীয় ঐতিহ্যের প্রশ্ন সমসাময়িকতার প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জ
সোভিয়েত পত্রপত্রিকাগুলিতে বিশেষভাবে এই সম্পর্কের দিকটা আলো
হয়েছে। কোনো কোনো লেখক ঐতিহ্যগত জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও প
দ্বারা অভিভূত হয়ে ঐ জাতিগত ধারাকেই একমেবম্ অদ্বিতীয়ম্ করে
চেয়েছেন, বর্তমানের বহমান ও চলমান জীবনের রূপায়ণে নতুন
প্রকাশ-ধারার প্রয়োজন বিস্মৃত হয়েছেন।

কষ্টসাধ্য সাড়ম্বর রচনাশৈলী বা আঙ্গিকের প্রতি, মৃত শিল্পাদর্শের
ষোল-আনা অকুণ্ঠ আনুগত্য সোভিয়েত সাহিত্যের ধাতে নেই। এই
উপরোক্ত অভিমতের বিরূপ সমালোচনা হয়েছে কেবল মস্কোর পত্রপত্রি
নয়, অন্য প্রজাতন্ত্রগুলিরও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও।

শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত গভর্ন
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক আলোচনা-বৈঠকে এই সমস্যার একটা
সমাধানের পথ পরিষ্কার হয়েছে। এই সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি
কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এম. এ. সুসলফ বলেন :

"কোনো এক জাতীয় সংস্কৃতি থেকে অপর এক জাতীয়
পার্থক্যের বৈশিষ্ট্যকেই একমাত্র জাতীয় ঐতিহ্য বলে মনে করলে
হবে। যা কিছু জনগণের অতীতের সঙ্গে, তাদের ইতিহাসের সঙ্গে বি
তাকেই শুধু ঐতিহ্য বলা যায় না। সামাজিক বৈষম্য ও জা
নির্যাতনের কঠোর পরিবেশে রুদ্ধশ্বাস জনগণের জীবন প্রতিবিম্বিত

যে-সব আঙ্গিকের মাধ্যমে, সেইগুলিই একমাত্র কাম্য ও বাঞ্ছনীয় মনে করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। নতুন ঐতিহ্যও আমাদের গড়ে তুলতে হবে, নতুন ঐতিহ্যকে সমর্থনও জানাতে হবে। সাম্যবাদের পথে অগ্রসরমান সোভিয়েত দেশের সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত নতুন ঐতিহ্য, নতুন চারিত্রিক লক্ষণগুলি দেখবার, বুঝবার মতো চোখ থাকা চাই। জাতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশের জন্যে আমাদের সর্বতোভাবে সমর্থন করতে হবে, পরিপুষ্ট করতে হবে যা কিছু নূতন, যা কিছু সাম্যবাদমুখী, যা কিছু দেশের জনগণের দৈনন্দিন জীবন থেকে উদ্ভূত, উৎসারিত।"

জনগণ তাদের সাহিত্যের কাছে যে সব দাবি জানাচ্ছে সেই জরুরি চাহিদাই দক্ষতার প্রশ্নে একটা বিশেষ গুরুত্ব এনে দেয়। এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন সাহিত্যিকরা ও সাহিত্য-সমালোচকরা।

কবি ভেরা ইন্‌বার তাঁর "প্রেরণা ও রচনানৈপুণ্য" নামক গ্রন্থে বরিস গোর্বাতোফের ভাষণ থেকে এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : "যথাসম্ভব ভাবব্যঞ্জনা দিয়ে, আবেগ দিয়ে, যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে লেখকের অন্তরাত্মার বাণী পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়ার মধ্যেই যত কিছু দক্ষতা, যত কিছু নৈপুণ্য।" ভেরা ইন্‌বারের অভিমতে, এই সংজ্ঞাটি "চমৎকার"। বস্তুত, সাহিত্যিক নৈপুণ্যের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এই সংজ্ঞায় সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। তবু বলতে হবে, এই সংজ্ঞাটি বেশ একটু সঙ্কীর্ণ, শিল্পকলার ভাবাদর্শগত বস্তু থেকে সম্পর্কচ্যুত।

কন্‌স্তান্তিন ফেদিন তাঁর "লেখক, শিল্প ও যুগ" নামক গ্রন্থে নৈপুণ্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমি মনে করি, লেখকের নৈপুণ্য সর্বপ্রথমে তাঁর জীবনকে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করার দক্ষতায় এবং সেই দক্ষতারই সঙ্গে এসে যোগ দেয় জীবনের শিল্পসম্মত রূপায়ণের দক্ষতা। লেখকের শিল্প, তাঁর শিল্পগত দক্ষতা প্রয়োগ করা চলে একমাত্র পর্যবেক্ষিত ও পরিজ্ঞাত বিষয়বস্তুর উপরেই। জীবনই আঙ্গিক টেনে আনে।"

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্য এই দক্ষতা ও নৈপুণ্যকেই বড় করে দেখে।

ভেরা ইন্‌বার সাহিত্য-সেবক মাত্রকেই সম্বোধন করে বলছেন : "প্রিয় লেখক, আপনার লেখার ঘটনাস্থলে আমায় নিয়ে যান, সেই পরিবেশের মধ্যে

৩

নিয়ে দাঁড় করান। কিন্তু দাঁড় করাতে হবে এমনিভাবে যাতে করে আমি যেন ঐ আবেষ্টনের অঙ্গীভূত হয়ে যেতে পারি, আপনার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে, সমগ্র আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারি।"

শিল্পীর জীবনবোধ গভীর ও ব্যাপক হতে পারলে তবেই তাঁর বাস্তব জগতের রূপায়ণ, সমস্ত খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাঁর সম্যক সচেতনা সার্থক ও ফলপ্রসূ হতে পারে। শিল্পী কেবল বিশ্লেষণ ও খুঁটিনাটিরই শিল্পী নন, তিনি সংশ্লেষণ ও সমন্বয়েরও শিল্পী।

সমাজতান্ত্রিক নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে দক্ষতা, ক্ষমতা বা নৈপুণ্যের প্রশ্ন লেখকের দায়দায়িত্বের প্রশ্ন—জনগণের প্রতি দায়িত্ব, উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রামরত জনগণের জীবনের সার্থক, সুন্দর, যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের দায়িত্ব।

বহুজাতিক সোভিয়েত সাহিত্যে বর্তমানে এক প্রবল প্রাণ-চাঞ্চল্য। এই সাহিত্যে কেবল চলার আবেগ, সৃজনী এষণার পথে অনবচ্ছিন্ন গতি-প্রক্রিয়া। এই অন্বেষা যে কতখানি ফলবতী হয়েছে তার একটা ধারণা করার পক্ষে বিগত কয়েক বছরের সোভিয়েত সাহিত্যের ক্রমবিকাশের উপর একটিবার চোখ বুলিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। এই অধ্যায়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে মিখাইল শলোকফের "দি সয়েল অপটার্নড্" উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের রচনার পরিসমাপ্তি। মহান রুশ দার্শনিক ও গণতন্ত্রবাদী এন. জি. চের্নিশেভস্কি সাহিত্যের এক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, সাহিত্য হচ্ছে "জীবনের পাঠ্য-পুস্তক"। এই উক্তির সারবত্তার এক জলন্ত প্রমাণ শলোকফের ঐ অপূর্ব উপন্যাস। আর একখানি সবিশেষ স্মরণীয় গ্রন্থ এ. ৎভারদোভস্কির লেখা "স্পেস্ বিয়ণ্ড্ স্পেস্"।

এম. বুবেনফের "ঈগল স্তেপ্", বি. কার্বাবায়েফের "নেবিত্-দাগ" ও আরও কতিপয় সোভিয়েত লেখকের কতকগুলি সার্থক রচনা সোভিয়েত পাঠক-সমাজের মন কেড়ে নিয়েছে।

এই সব গ্রন্থ বিচিত্র—বিচিত্র রচনাশৈলীতে, বিচিত্র নিজস্ব জাতীয় বর্ণাবলেপে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে এক অভিন্ন, অখণ্ড ঐক্য-সূত্র। তা হচ্ছে আধুনিক সোভিয়েত মানুষের আত্মিক চাহিদার পরিপূরণে সাড়া দেবার অকপট আগ্রহ। এই বৈশিষ্ট্যেরই জন্যে এই সব গ্রন্থ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পাঠক-সমাজের কছে সমাদৃত হয়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে।

রবীন্দ্রমানসের স্তম্ভিত উপত্যকা

শম্ভু মুখোপাধ্যায়

[ভক্তিশেলের মারে ভক্তের দল রবীন্দ্রনাথকে প্রায় 'অবাঙ্‌মানসগোচর' করে তুলতে চান; 'কলরবমুখর খ্যাতির প্রাঙ্গণে' অন্ধ ভক্তির অসাহিত্যিক অত্যাচারে 'গুরুদেব' আজ 'বজ্রযানী' গুরুর পর্যায়ে নির্বাসিতপ্রায়। তাই রবীন্দ্রকাব্য-জিজ্ঞাসায় হাওয়াবদল অপরিহার্য। সমালোচনায় পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির জন্য কালগত ব্যবধানের সুবিধাও উপস্থিত।

প্রশ্ন জেগেছিল পঁচাত্তর বছরের 'দাড়িওয়ালা বুড়ো যাদুকরটা' 'পথের ধারে ঘাসের উপর চাদর মেলে দিয়ে' 'খাপছাড়া', 'ছড়ার-ছবি'র এ কী প্রলাপ বকতে শুরু করল'—কেনই বা তার জীবনের প্রদোষকালে চিত্রানুশীলনের প্রয়াস!

বর্তমান নিবন্ধটি এই কাব্যজিজ্ঞাসার উত্তরের ইঙ্গিতটুকুমাত্র বহন করে; ভূমিকার আবহাওয়াটি সমাদর পেলে ভবিষ্যতে সদুত্তরের ভূমিটিকে প্রশস্ততর করবার আশা রাখি।

প্রবন্ধকার।]

। ক ।

শেক্‌স্‌পীয়র প্রসঙ্গে কড্‌ওয়েল বলছেন: "His position, his...'perspective', enabled him to comprehend in one era all the trends which in later eras were to separate out and so be beyond the compass of one treatment. It was not enough to reveal the dewy freshness of love in 'Romeo and Juliet', the fatal empire shattering drowsiness in 'Antony and Cleopetra', or the pageant of individual human wills in conflict in 'Macbeth', 'Hamlet', 'Lear' and 'Othello'. It was necessary to taste the dregs to anticipate the era of surrealisme and James Joyce and write 'Timon of Athens', to express the degradation caused by the decadence which sweeps away all the past loyalties in order to realise the human spirit, only to find this spirit the miserable prisoner of the cash-nexus..."

বিচিত্র কাব্যসৃষ্টির ভাববন্ধনে শেক্‌স্‌পীয়র Marlowe থেকে James Joyce অবধি ইংরেজী সাহিত্যের সেতু যোজনা করেছেন। এলিজাবেথীয়

যুগকে অতিক্রম করে তাঁর ক্রান্তদর্শিতা আধুনিক যুগের অস্পষ্ট আভাস রচনা করেছে তাঁর কবিকৃতিতে। আবার বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি যুগকেও একক ধারাবাহিকতায় অখণ্ডভাবে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ; কাব্যরীতি, ভাব ও অলংকারে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যযুগীয় আবহাওয়া থেকে রবীন্দ্র-কাব্যধারা আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবাহিত। "আকাশ-প্রদীপের" উৎসর্গপত্রে সুধীন্দ্র দত্তকে বলছেন—"বয়সে তোমাকে অনেক দূর পেরিয়ে এসেছি তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে—এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম।" কাব্যসূত্রে এই যে যুগবন্ধন এ তো কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়। "জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটিয়েছে আর কিছুতে নয়, তার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত", সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসে এর সাক্ষ্য মিলবে। এলিজাবেথীয় সমুদ্রযাত্রাও একদিন শেক্স্পীয়রের মানসলোকে নতুন দিগন্তের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছিল। কবিকৃতির সামাজিক পটভূমিকা বিশ্লেষণের সূত্রে রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্যের রহস্যের সন্ধানও দুরূহ নয়।

'মহুয়ার' কাল পর্যন্ত কবি 'আপনার নিভৃত রূপ দেখেছেন ছায়ায় পরিকীর্ণ—যেন পাহাড়তলিতে একখানা অনুত্তরঙ্গ সরোবর ;—তীরের গাছ থেকে সেখানে বসন্ত-শেষের ফুল পড়ে ঝরে, ছেলেরা ভাসায় খেলার নৌকো, কলস ভরে নেয় তরুণীরা…তারপর কালবৈশাখীর পাখার ঝাপটে স্থির জলে এল অশান্তির উন্মথন,…পাথর ডিঙিয়ে আপন সীমানা চূর্ণ করতে করতে সে জলধারা ছুটে চলল নতুন প্রবাহের পথে।' 'পরিশেষের' দিগন্তে 'মহুয়ার' মদির মায়ায় বিহ্বল আকাশ বাঁধা পড়ল। এই দিগন্ত ক্রান্তির লক্ষণাক্রান্ত। 'পরিশেষ' পুরনো কাব্যরীতি ও আত্মকেন্দ্রিক ভাবোচ্ছ্বাসের লীলার পরিশিষ্ট অধ্যায়—'পুনশ্চে' নবপর্যায়ের প্রবর্তনা। 'কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়।' কাব্যে এই যে হাওয়াবদল—এ থেকে সৃষ্টিবদল হল। 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ' রবীন্দ্রকাব্যের ঋতুপরিবর্তনের নিশ্চিত স্বাক্ষর বহন করে। এরপর থেকে কাব্যের ভাবসম্পদ সমাজসচেতনতা ও ইতিহাসবোধচিহ্নিত। কবির দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

অধিকতরভাবে প্রগতিপন্থী হল—এটা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। শোনা যায় যুগসংকটের সংক্রমণে শেষ বয়সে রোঁল্যাও নাকি প্রগতির ব্যাধিতে ভুগেছিলেন। কেন এমন হল—এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক ; এর জবাবে কাব্যে হাওয়াবদলের রহস্যটিরও সন্ধান মিলবে।

'পরিশেষ' কাব্যের রচনাকাল—এপ্রিল, ১৯৩১ ; সমসাময়িক কবি-জীবনীতে সমাজসচেতনতা ও ইতিহাসবোধের অঙ্কুরের পরিচয় রয়েছে। ১৯৩০-এর অক্টোবরে রাশিয়াভ্রমণ সেরে কবি চলেছেন আমেরিকার পথে ; অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দেবার কালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন :

> "আমার পৃথিবীর মেয়াদ সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে ; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।…বার বার মনে হয় বাণপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়।"

বার্লিন থেকে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখেছেন—"তোমার দুখানি চিঠি পাওয়া গেল, ঘনবর্ষার চিঠি, শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপর মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেছে, সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কী রকম উৎসুক হয়ে ওঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য। কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথা।…" রাশিয়াভ্রমণ সমগ্রভাবে কবির মনকে নাড়া দিল—এটা কবির আত্মস্বীকৃতি। কবিচিত্তের এই অন্তর্লীন উতরোলের আশ্চর্য উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটিকা।

১৩৩৯ কার্তিকের (ইং ১৯৩২) বিচিত্রায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখযোগ্য ; কবি এই নাটিকাটি শরৎচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করে লিখছেন—"তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয় নি।…কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক।'…এই উৎসর্গপত্র গভীর অর্থবহ।

…রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল।

সন্ন্যাসী বলছেন—দেখতে পাচ্ছ না,—আজ ধনীর আছে ধন, তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মত। ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস।...

সৈনিক বলছে—এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

শূদ্রদলের দলপতি বলছেন—আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ। শূদ্রের দল রথের রশি ধরে টানতেই অবশেষে মহাকালের রথ চলতে শুরু করল। ধনপতির কাছে এ এক চরম বিপর্যয়, প্রলয়।

কবি বলছেন—যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।

যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিঁকে যায়, তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

সৈনিক জিজ্ঞাসা করল—তুমি কী করবে কবি?

কবি বললেন—আমি তাল রেখে রেখে গান গাব। কবিজীবনের শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাই তাল রেখে রেখে গান গাইতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র-জীবনের শেষ দশকে সমাজ ও সভ্যতার যুগসংকট;...জীবনের অলক্ষ্য গভীরে সমাজসচেতনতা আর ইতিহাসবোধের প্রতিসরিত আলোক নতুন কাব্য-প্রতিভাস রচনা করল। সমাজসচেতনতা ও ইতিহাসবোধ সমৃদ্ধ ভাবসম্পদে কাব্যপ্রবাহের ধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হল। কাব্যের এ এক ঋতু-পরিবর্তনের পর্যায়।

পুরনো আঙ্গিকের বন্ধনমুক্ত হয়ে নতুন ভাব-ঐশ্বর্য নতুন রূপ-রেখায় ধরা দিতে চাইল। "মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম করে সাজিয়ে তুলত।...মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্য।...আত্মকেন্দ্রিক অবসরের কাব্যে তাই অলংকার, উপকরণের বাহুল্য ছিল—ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার করে তাই মোহ জন্মাবার চেষ্টা ছিল।...কিন্তু আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা আজ জীবনকে গ্রাস করেছে।...কাব্য তাহলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন্ রাস্তায় বেরোবে। নিজের মনের মতো করে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না।..."

'পরিশেষের' 'পত্রলেখা' কবিতায় কবি আঙ্গিকের বন্ধনমুক্তির আভাস

জানিয়েছেন; পুরনো কাব্যরীতি ও অলংকারকে বিদায় জানিয়ে পত্র লিখছেন:

দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন—
কতমতো লেখার আসবাব।
ছোটো ডেস্‌কোখানি
আখরোট কাঠ দিয়ে গড়া।
ছাপ মারা চিঠির কাগজ
নানা বহরের।
রুপোর কাগজ-কাটা এনামেল করা।
কাঁচি, ছুরি, গালা, লাল ফিতে।
কাঁচের কাগজ-চাপা,
লাল নীল সবুজ পেনসিল,
বলে গিয়েছিলে তুমি, চিঠি লেখা চাই
একদিন পরে পরে॥

দশটা তো বেজে গেল।
তোমার ভাইপো বকু যাবে ইস্কুলে,
যাই তাকে খাইয়ে আসি গে।
শেষবার এই লিখে যাই—
তুমি চলে গেছ।
বাকি আর যত-কিছু
হিজিবিজি আঁকাজোঁকা ব্লটিঙের পরে॥

দশটা তো বেজে গেল, ভাইপো বকু যাবে ইস্কুলে..."তাই এ যুগের কাব্যব্যবস্থায়—যে ব্যয়-সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে।...কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল, এখন এল বিষয়ের আত্মতা। এই জন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হল, অলংকারের উপর নয়।" কাব্যে গদ্যছন্দের প্রবর্তনা করলেন ক্রান্তদর্শী কবি। আঙ্গিকের বন্ধনমুক্তির ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করছে 'শেষ সপ্তকে'র 'আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে' কবিতা:

বন্ধু বললে,
এলেম তোমার ঘরে
ভরা পেয়ালার তৃষ্ণা নিয়ে।
তুমি খেপার মতো বললে,
আজকের মতো ভেঙে ফেলেছি
ছন্দের সেই পুরানো পেয়ালাখানা।

সভার লোকে বললে,
'এ যে তোমার আবাঁধা বেণীর বাণী—
বন্দিনী সে গেল কোথায় ?'
আমি বলি,
তাকে তুমি পারবে না আজ চিনতে ;
তার সাতনলী হারে আজ ঝলক নেই,
চমক দিচ্ছে না চুনি-বসানো কঙ্কনে।

—মুঠোয় করে ধরবার জন্যে সে নয়,
তার অসাজানো আটপহুরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে তার আপন স্থানে
মানবার কাল এসেছে।

এর পর আত্মকেন্দ্রিকতা ও সমাজসচেতনতার মধ্যে সেতুযোজনার উৎকণ্ঠায় রবীন্দ্রমানসের প্রহর কেটেছে। রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্যায়ে সভ্যতার সংকট কবির স্পর্শচেতন চিত্তকে তীব্রভাবে আঘাত করেছিল। কালান্তরের পূর্বে সমাজ রোগে জর্জর ; ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ে ইওরোপ দৃষ্টিহারা ; শ্মশানের প্রান্তচরেরা আবর্জনাকুণ্ড ঘিরে নির্লজ্জ হিংসায় হানাহানি শুরু করে দিয়েছে। পৃথিবীব্যাপী ধনিকতন্ত্রের সংকটের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের এই হিংস্র অন্ধকারে ঔপনিবেশিক (colonial) জীবনযাত্রার তৈলহীন স্তিমিত শিখা নির্বাণোন্মুখ—ঔপনিবেশিক 'কালচারের' আয়ু শেষ হয়ে এল ; বাংলার কৃত্রিম 'কালচারের' ছিল না উপকরণগত স্থিরতা, পরিবেশে ছিল না সমাজগত পুষ্টি—শুধুমাত্র মানসিক আবেগভিত্তিক 'কালচারে'র দিন ফুরিয়ে এল ১৯৩০-এর পরেই। রবীন্দ্রকাব্যও পরিণামে এ সংকটের লক্ষণাক্রান্ত

হল। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে এক কালান্তরের সূচনায় সেখানকার সাহিত্যকারের মানসলোকে ভাববিপ্লব ঘটেছিল। নতুন ভাবসমৃদ্ধ কাব্য সেদিন তাই নব নব আঙ্গিকের আভরণে বৈচিত্র্য লাভ করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইংরেজী কাব্যও অন্য এক যুগসংকটের কাব্য। "বহুযুগ প্রচলিত যত কিছু আচার, আদব ও আব্রু তা সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল।" ব্যক্তি ও সমাজের চরম সংঘর্ষমুহূর্তে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানসঅভিযোজনা সব-কবির পক্ষে সম্ভব নয় ; তাই তাদের সমাজবোধ যথেষ্ট প্রখর হলেও তাদের কাব্যে অদ্ভুত আত্ম-কেন্দ্রিকতার গন্ধ মেলে ; টি. এস. এলিয়টের কাব্য এর সাক্ষ্য বহন করে :

—At the violet hour, when the eyes and back
Turn upward from the desk, when the human
engine waits
Like a taxi throbbing waiting.

At the violet hour, the evening hour that strikes
Homeward, and brings the sailor home from sea,
The typist home at teatime....

কবি এখানে যথেষ্ট পরিমাণে সমাজসচেতন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভাঙনের অনুভূতিও তার কাব্যকে চিহ্নিত করেছে—

Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal....

তথাপি 'The Waste Land' দুরূহতা, অন্তর্মুখীনতা, প্রতীকতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট। দুরূহ আঙ্গিকবিলাস নিঃসন্দেহে যুগসংকটের অসুস্থতার লক্ষণ। আঙ্গিক রসবোধের কারণ নয়, আঙ্গিকের সাহায্যে রস নিষ্পন্ন হয় মাত্র ; অতএব আঙ্গিকবিলাস অসুস্থতা। রূপ-কল্পের সঙ্গে সমাজ-সচেতনতা ও ইতিহাসবোধ-সমৃদ্ধ ভাবসম্পদের স্বাঙ্গীকরণের সুস্থ দায়িত্বপালনে এরা পরাঙ্মুখ ; সমকালীন আরও অনেকে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানস-অভিযোজনা ঘটাতে পারেন নি—তাই কাব্যরীতির বন্ধনমুক্তি ঘটলেও

নতুন আঙ্গিকে আত্মকেন্দ্রিকতার মোহগ্রস্ত-কাব্যসৃষ্টি করতে গিয়ে স্বা... এক বিচিত্র কাব্যপ্রবাহের সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসে আঙ্গিকবিলাস, আত্মতন্ত্রতা প্রভৃতি অবক্ষয়-যুগ-নিদর্শন মিলবে জয়েস্, হাক্সলির রচনায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইওরোপে আজও সেই অবক্ষয়ের যুগ চলছে, ক্রান্তির পর্যায় সেখানে প্রসারিত। সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এ সংকটের লক্ষণ চিত্রকলায় ফুটে উঠেছে; এটাই স্বাভাবিক; চিত্রশিল্পীর আত্মসমীকরণের পদ্ধতি আর রেখা ও রঙের বন্ধনে ভাবঐশ্বর্যকে রূপায়ণ প্রত্যক্ষতর। পশ্চিম ইওরোপের সাম্প্রতিক চিত্রকলায় এ সংকটের লক্ষণ পরিস্ফুট। নতুন আঙ্গিকের সঙ্গে পুরাতন আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রয়াস সমসাময়িক পশ্চিম ইওরোপীয়দের সাহিত্যের ধারাকে চিহ্নিত করে।

ব্যক্তি ও সমাজের চরম সংঘর্ষমুহূর্তে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সমাজসচেতনতার মধ্যে সেতুবন্ধের প্রয়াসে রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায় কেটেছে। রূপকরে... সঙ্গে ভাবসম্পদের সুস্থ স্বাঙ্গীকরণের সাহিত্যিক দায়িত্বপালনের প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্য এক বিচিত্র পথ ধরেছে। 'ছড়া ও ছবি' কবিচিত্তের অন্তিম ক্রান্তির কাব্য-প্রতিভাস।

ডুগ্‌ডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে
একটুখানি মুচকি হেসে
যা-তা মন্ত্র আউড়ে শেষে
ঘাসের পরে চাদর মেলে—

'খাপছাড়া', 'প্রহাসিনী', 'ছড়ার ছবির' বিচিত্র পসরা ছড়িয়ে পথের প্রান্তে বসল দাড়িওয়ালা বুড়ো যাদুকর। এই অনাসৃষ্টির সৃষ্টিগুলো 'ক্ষণকালের ভোজবাজির ঠাট্টা' বলে তো মনে হয় না—শেক্‌স্‌পীয়রের ট্রাজেডির Comic Interlude-এর সমধর্মী এরা নয়। সেতুযোজনার সংকটে এ খেয়ালীপনা রবীন্দ্রমানসের স্তম্ভিত উপত্যকা। রবীন্দ্রজীবনের শেষপর্যায়ের চিত্রাঙ্কনীও এই সংকটের লক্ষণাক্রান্ত।

। খ ।

ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।

এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে—
যার কোনো দাম নেই,
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয়নি কখনো।

'ফসলের কালশেষে শূন্যমাঠে ফোটা তুচ্ছ ফুলের' যথার্থ মর্যাদা নির্ণয়ের সময় হল। "অলস মনের আকাশে প্রদোষে কোন্ এক স্বপ্নরাজের ডাকে এলোমেলো ছিন্নচেতন টুকরো কথার ঝাঁক এসে অকারণের আসর জমালো;···ঘোলা মনের এই যে অনাসৃষ্টির সৃষ্টি তার কারো আছে ভাবের আভাস কারো বা নেই অর্থ। মনের গহন হতে বায়ুস্রোতে ভেসে এল কবির খেয়ালছবি;—নিয়মের দিগন্ত পেরিয়ে হারিয়ে গেল তারা নিরুদ্দেশে বাউলের বেশে।" 'অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়', 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'সে', 'গল্পসল্প', 'ছড়া'—নৈরাজ্যের ভাষণ, অণুর বিবৃতি। নতুন আঙ্গিকের সঙ্গে সমাজসচেতনতা ও ইতিহাসবোধ সমৃদ্ধ ভাবসম্পদের সুস্থ স্বাঙ্গীকরণের সংকট মুহূর্তে কবিচিত্ত ভগ্নাংশবিলাসিতায় মগ্ন! ব্যক্তি সত্তার নিঃসঙ্গ অঙ্গন থেকে বেরিয়ে সমষ্টি-সীমান্তে চেতনার ব্যাপ্তির ক্রান্তির এই-প্রহর স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় কেটেছে। অবচেতনার অবদান আর ক্ষীণ সমাজচিহ্নের বিপ্রতীপ ভাবপ্রেরণা ছড়ার অনাড়ম্বর আভরণে কাব্যরূপ নিল। 'ছড়ার গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমোর রাখে না'।······'ছড়ায় ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেই সব ভাবের উপযুক্ত—যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে-চলার-চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়'।

—Every revolution in poetry is apt to be a return to common speech.......The music of poetry must be a music latent in the common speech of its time. 'ছড়া'র আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে এলিয়টের এ সিদ্ধান্তের অঙ্গীকার রয়েছে। 'Poetry has always before it an endless adventure'—কাব্যের অধিকার নিয়ত প্রসস্ততর হয়েই চলেছে। এককালের খাতিরে কবিচিত্ত তাই অন্যকালকে অস্বীকার

করে নি। রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রথম ও প্রধান কবি নিঃসন্দেহে স্ব
রবীন্দ্রনাথ।

সাগরপারের সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সেদিন মনোবিশ্লেষণতত্ত্ব নতুন নতুন Poetic imageryর জোগান দিতে শুরু করেছে। ইংরেজী সাহিত্যে তখন কাব্য-উপন্যাসে আঙ্গিকের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায় চলেছে,— এ সাহিত্যিক সংবাদ রবীন্দ্রনাথের অগোচর ছিল বলে তো মনে হয় না। বরং একে আত্মসাৎ করে নবতর রূপকল্পে পরিবেশনের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। 'সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি'—কবির এই মন্তব্য সংবলিত একটি কৌতুকচিত্রসহ 'অবচেতনার অবদান' নাম নিয়ে 'ছড়ার' সপ্তম কবিতাটি ১৩৪৬ সালের (ইং ১৯৩৯) অগ্রহায়ণে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতাটির মুখবন্ধে কবি লিখছেন :

"অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।" (শনিবারের চিঠি। ১৩৪৬, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২৯৫)

ছড়াটির একটু নমুনা সংগ্রহ করা যাক :

··কলেজ পাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নি।
ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায়
সত্যপিরের সিন্নি।

গরাণহাটার সজনে ডাঁটা
কিনছে পুলিস সার্জন।
চিৎপুরে ঐ নাগা সন্ন্যাসী
কাত হ'য়ে মরে চারজন।···
ইত্যাদি।

রবিচিত্তের 'স্বচ্ছ আলোর সৃষ্টি'র দিকে যখন চেয়ে দেখি তখন মনে সংশয় জাগে হঠাৎ কবির এ কী খেয়ালীপনা। বাঁধনটাকেই তো অর্থ বলে জানি। ছিন্নবন্ধন কথা আর ছবির এই যে মিছিল এর রহস্য কোথায়? 'খেয়াল

স্রোতের ধারায় কী সব ডুবছে এবং ভাসছে—ওরা কী যে দেয় না জবাব, কোথা থেকে আসছে।' অর্থহীন আপাতঃ অসংলগ্নতার গভীরে সমাজ-চেতনার একটা ক্ষীণ অন্তঃস্রোতের আভাস মেলে। 'ছড়ার' রচনাকাল ১৯৩৯—৪০। সমসাময়িক ঘটনাবলী স্মরণ করতে চেষ্টা করলে কলেজপাড়ায় অন্ধ কলুর গিন্নি কেন শেয়াল তাড়ায় আর পুলিস সার্জনের গরাণহাটায় সজনে ডাঁটা কিনবার তাগিদটা কি—কেনই বা সেদিন সিরাজগঞ্জেও বিরাট মিটিং আর তুলো বের করা বালিশের চিত্রটি কবিচিত্তে দোলা দিল—সে সংবাদটি স্পষ্টতর হবে বলেই তো মনে হয়। সমসাময়িক পরিবেশ বিচারে বিচলিত কবি-চৈতন্যের বিশেষ উদ্‌বোধনের হেতুনির্ণয় নিঃসন্দেহে সহজ হবে।

১৯৩৬ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে কোন্ এক উচ্ছ্বাসে পাগলামির বেড়া ভেঙে হো হো করে হেসে উঠলেন কবি তাঁর 'খাপছাড়া'য় ; ছড়া ও ছবির মিলনে এক নতুন সৃষ্টির পর্যায় শুরু হল। রঙীন ছবিতে আর রেখাচিত্রের বন্ধনে পথে চলার চালে চলল ছড়ার প্রবাহ ; 'ভদ্রসমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে দুরূহ তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর।' ছড়ার গতি-প্রকৃতি মোটামুটি বোঝা গেল ; এবারে ভাবসমৃদ্ধির ভাবনায় আসা যাক। ১৯৩৬-৩৭ সালে ইওরোপে বর্বরতা নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তারে উদ্যত ; কালান্তরের পূর্বে সমাজ রোগে জর্জর। কবির মানসলোকে তখন ভাববিপ্লবের পালা। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানস অভিযোজনার নিয়ত প্রয়াসে সমাজবোধ তাঁর প্রখরতা লাভ করছে। তাই 'খাপছাড়া'য় ক্ষীণ সমাজচিহ্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ধনতান্ত্রিক সমাজে সেদিন অর্থনৈতিক মন্দার সংক্রমণ শুরু হয়েছে :

চিন্তাহরণ দালালের বাড়ি
গিয়ে
একশো টাকার একখানি নোট
দিয়ে
তিনখানা নোট আনে সে
দশ টাকার।

কাগজ-গণতি মুনাফা যতই
বাড়ে
টাকার গণতি লক্ষ্মী ততই
ছাড়ে
কিছুতে বুঝিতে পারে না
দোষটা কার।

মুদ্রাস্ফীতির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে ছড়ার বিষয়বস্তু করে কবি ক…
তত্ত্বকে সর্বজনবোধ্য রূপ দিতে চেয়েছেন। 'ধনীর দৈন্যের অত্যাচার' …
পেয়েছে আর একটি ছড়ায় :

নাম তার চিন্তুলাল
হরিরাম মতিভয়
কিছুতে ঠকায় কেউ
এই তার অতি ভয়।
সাতানব্বই থেকে
তেরোদিন ব'কে ব'কে
বারোতে নামিয়ে এনে
তবু ভাবে, গেল ঠকে।
মনে মনে আঁক কষে,
পদে পদে ক্ষতি-ভয়।
কষ্টে কেরানী তার
টি'কে আছে কতিপয়।

চিন্তুলাল হরিরাম মতিভয়-ধর্মী শোষকের লোভের শিকার অসহা…
মধ্যবিত্তের ভাগ্য বিড়ম্বনার নিপুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি অন্য এক…
ছড়ার লঘু রেখা বন্ধনে :

যে-মাসেতে আপিসেতে
হল তার নাম ছাঁটা
স্ত্রীর শাড়ি নিজে পরে,
স্ত্রী পরিল গামছাটা।

বলে, "আমি বৈরাগী,
ছেড়ে দেব শিগ্‌গির,
ঘরে মোর যত আছে
বিলাস-সামিগ্‌গির।"
ছিল তার টিনে-গড়া
চা খাওয়ার চাম্‌চাটা,
কেউ তা কেনে না সেটা
যত করে দাম ছাঁটা।

এর পরে ১৯৩৭ সালের মে-জুন মাসে আলমোড়ায় 'ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি' করতে এল 'ছড়ার ছবি'। 'ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে, ওরা অর্থলোভী জাত নয়।' 'ছেলেবেলার' ভূমিকায় কবি লিখছেন—"কিছুকাল হল একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের।" 'শনির দশা'য় 'উমিকে' খুশি করলেন কবি 'ছড়ার' 'জাপানি ঝুম্‌ঝুমি' বাজিয়ে।

'অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি' 'ছড়ার' (১৯৪০) স্বাদ নেবার আগে সাগরপারের সমকালীন সাহিত্যের হাটে খেয়াল-স্রোতের ধারায় রসসৃষ্টির কী মরশুম চলছে তার পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। মহৎ কবিকৃতির পরিচয় ঘোষণায় এলিয়ট বলছেন :

"The great poet, in writing himself, writes his time. Thus Dante, hardly knowing it, became the voice of the thirteenth Century; Shakespeare, hardly knowing it, became the representative of the end of the sixteenth Century, of a turning point in history." (Shakespeaıe and the Stoicism of Seneca—*T. S. Eliot.*)

—আর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কালান্তরের সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ। বাঙালীর মানস-পরিমণ্ডলের বিচারে এই কালান্তরের ক্রান্তিচিহ্ন কিছু বুঝে নেওয়া যাক ; কোম্পানীর কেরানীশালার তাগিদে বিপুল উদ্যমে এতকাল 'ভদ্রলোক' ও 'শিক্ষিত সমাজ' তৈরি হয়ে এসেছে ; বণিকতন্ত্রের পরিশোধিত 'পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা'র প্রসাদগুণে ইওরোপীয় বুর্জোয়ামনের সঙ্গে

অভিন্ন মনে করে আমাদের মন কলকাতা কেন্দ্রিক শহুরে 'বাঙালী কালচার' রচনা করেছি। শুধুমাত্র subjective প্রেরণাকে ভিত্তি করে মাত্র কয়েকজন চাকুরের প্রয়াসে যে 'কালচার' রূপ পেল তার মূলে ছিল না উপকরণের স্থিরতা—না ছিল তার পরিবেশে সমাজগত পুষ্টি! এ সংস্কৃতির প্রেরণার ছিল না বস্তুগত ভিত্তি—শুধুমাত্র ইংরেজী বুর্জোয়া শিক্ষার রসাস্বাদনের মধ্য দিয়ে আহৃত হয়েছে এর আবেগ-প্রেরণা। ধনিকতন্ত্রের একটা মানসিক সংস্কৃতির পরিচয়ের উত্তরাধিকার আমরা পেলাম কিন্তু কোথায় তার বাস্তব বনিয়াদ? দেশের অর্থনৈতিক বিন্যাসে চলছে উপনিবেশিক জমিদারতন্ত্র—অর্থাৎ একটা অর্ধসামন্তযুগ আর মানস-পরিমণ্ডলে আমরা বহন করছি বুর্জোয়া সংস্কৃতির একটা বনিয়াদহীন আবহাওয়া। এমন দিনে ঘনিয়ে এল পৃথিবীব্যাপী ধনিকতন্ত্রের সঙ্কট—ফলে আমাদের 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রা' সংক্রমিত হল। ১৯৩০-এর পরে 'শিক্ষিত সমাজ' ও 'ভদ্রলোকের' 'বাঙালী কালচারে'ও আয়ু শেষ হয়ে এল। ১৯৩০-এর পরে রবীন্দ্ররচনাবলী এই কালান্তরের কাব্য-প্রতিভাস।

প্রতীচ্যের চিত্তভূমি থেকে উৎসারিত সংকটের লক্ষণাক্রান্ত কবিকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় শুরু হয়েছিল ইতিপূর্বেই। সাইকোএনালিসিস আর কোয়াণ্টামতত্ত্ব ইংরেজী কবি ও সাহিত্যিকদের বিচলিত চৈতন্যে বিশেষ উদ্‌বোধন প্রার্থনা করছে—এ সংবাদ বিশ্বকবির অগোচর ছিল বলে তো মনে হয় না।

No poet, no artist of any art has his complete meaning alone......a part of an author's imagery comes from his reading. এলিয়টের কবিপ্রকৃতি ও কাব্যপ্রেরণার এই বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ক্রান্তদর্শী কবি সাগরপারের রসলোকের গোপন সংবাদটি বহন করে এনেছেন ছড়ার নতুন রূপ বিভঙ্গে; এ এক নতুন অনাগত কাব্যলোকের অস্পষ্ট অঙ্গীকার। "ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম"—মানস প্রেরণার অনাগত রূপ নির্দেশে কবির এ এক সরস প্রতিশ্রুতি।

Virginia Woolf সমসাময়িক ইংরেজী সাহিত্যে রসসৃষ্টির মৌলিক প্রেরণার নির্দেশ জানিয়েছেন তাঁর "The Common Reader" বইয়ে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টা বুঝে নেওয়া ভাল:

"Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day. The mind receives a myriad impressions—trivial, fantastic, evanascent, or engraved with the sharpness of steel. From all sides they come, an incessant shower of innumerable atoms;...the atoms as they fall upon the mind in the order in which they fall, by tracing the pattern, however disconnected and incoherent in appearance, which each sight or incident scores upon the consciousness."

ব্যক্তিচৈতন্যে অভিজ্ঞতার আপাতঃ অসংলগ্ন বিচূর্ণ আণবিক আস্বাদনের প্রয়াস পদার্থবিদ্যার কোয়াণ্টামতত্ত্বে সমর্থন লাভ করেছে। সমসাময়িক ইংরেজী কাব্য ও উপন্যাস হয়ে উঠেছে নৈরাজ্যের ভাষণ, অণুর বিবৃতি। একাধিক রসশিল্পীর মধ্যে বহুল পরিচিত James Joyce-এর রচনায় এই ভগ্নাংশবিলাসিতা স্পষ্ট ও প্রখর।

Joyce-এর সুবিখ্যাত অণু উপনিষদ Ulyssess থেকে সামান্য একটা উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টা বোঝা যাবে:

"...Bald deaf Pat brought quite flat pad ink. Pat set with ink pen quite flat pad. Pat took plate dish knife fork. Pat went...."

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার রেওয়াজ প্রথম যুদ্ধোত্তর ইংরেজী সাহিত্যে অপ্রচুর নয়। Virginia Woolf-এর 'Jacob's Room' বইটি 'Novels as successions of scenes', 'Scenes as successions of Incidents' আর 'Headline'-এ উপন্যাস রচনার একটি নতুন আঙ্গিক রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয়।

ইংরেজী কাব্যোপন্যাসের এই বিচিত্র রূপবিভঙ্গের কথা স্মরণ রেখে এবারে রবীন্দ্রনাথের 'অবচেতন মনের কাব্য রচনার অভ্যাসের' পরিচয় নেওয়া যাক। কবির হাতে লেখা, 'ছড়া'র পঞ্চম কবিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতার পূর্বাভাস মেলে; ছড়াটির গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেই যেন কবি ওর নাম দিলেন—'চলচ্চিত্র'; এ নামকরণ গভীর অর্থ বহন করে:

মাথার থেকে ধানী রঙের ওড়না-খানা সরে যায়,
চীনের টবে হাস্নুহানার গন্ধে বাতাস ভরে যায়।
তিনটে পাঠান মালি আছে নুবাবজাদার বাগানে,
দুয়ারে তার ডালকুত্তো চীৎকারে রাত-জাগানে।

ধানশ্রীতে সানাই বাজে কুঞ্জবাবুর ফটকে,
দেউড়িতে ভিড় জমে গেছে নাটক দেখার চটকে।…
ইত্যাদি।

'কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,' ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ছড়া নিঃসন্দেহে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি।

একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চারিদিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।

বাঁধনটাকেই অর্থ বলি,
বাঁধন ছিড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা।

সহজ ছড়ার লঘু ছন্দের অস্পষ্ট অন্তর্বন্ধন আপাতঃ অদৃশ্য। বন্ধন সূত্রটাকে না চিনেও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে ছড়ার রস আস্বাদনে বাধা নেই। ব্যক্তিচৈতন্য অভিজ্ঞতার আণবিক প্রতিঘাতকে ছড়ার বিশিষ্ট রূপকল্পের বন্ধনে বাঁধলেন রবীন্দ্রনাথ; রসপরিবেশনে আঙ্গিক নির্বাচনের এ এক অভূতপূর্ব প্রয়াস। Joyce-এর অণু-উপনিষদ Ulyssess-এ তাঁর ভগ্নাংশবিলাসিতা বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির ভারে ক্লান্ত। এই অসুস্থ ক্লান্তি রসপিপাসাকে ব্যর্থ করে। Gerald Gould তার 'The English Novel'-এ Joyce-এর নৈরাশ্য ভাষণকে রসোত্তীর্ণ বলে স্বীকার করেন নি—"But, if it were as huge as twentyfour telephone directories, it could not register the actual thoughts and emotions which make up, for every single one of us, any single hour of the twentyfour. The tebphone directory is because of its vigorous selection and repression a work of art compared to the wastepaper basket. And 'Ulyssess' is a wastepaper basket!"

অনুরূপ প্রেরণার সৃষ্টি রবি ঠাকুরের ছড়া কিন্তু আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যে ধ্বনিগৌরবে এ নিন্দার স্পর্শ থেকে মুক্ত। সমাজসচেতনতার এই অন্তঃস্রোতের অস্পষ্ট আভাসও তার ছড়াকে ভাবগাম্ভীর্যের মর্যাদা দেয়।

এতকাল কবির লৌকিক প্রত্যয় ও কল্পলোকের প্রত্যয়ে কোনো বিরোধ কবিসত্তায় অনুভূত হয় নি। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কবিচিত্তে এক প্রত্যয় সংকট সমুপস্থিত। 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার' মৃত্তিকাহীন শুষ্কতা ক্রমশঃ কবির লৌকিক প্রত্যয়ে অনুস্যূত হয়ে কাব্য-প্রতিভাস প্রার্থনা করছে—কল্পলোকের প্রত্যয়ে তখনও ধনিকতন্ত্রের মানসিক সংস্কৃতির পর্যায় চলছে। নির্দ্বিধ অখণ্ড কাব্যপ্রত্যয়ের প্রসাদ থেকে কবিসত্তা তখন বঞ্চিত। ইংরোপীয় ধনিকতন্ত্রের মানস সংস্কৃতিতে তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কবিকৃতির প্রয়াসই প্রবল। কল্পলোকের প্রত্যয়ের অনুস্থিতিতে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের লীলা তখন অবচেতনার অবদানের কাব্যরূপে সার্থকতা লাভ করছে। ছড়া একদিকে তাই অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি—কাব্যে বিষয়ীর আত্মতার চরম পরিণতি—আত্মকেন্দ্রিকতার পরম প্রতিভাস। কল্পলোকের প্রত্যয়ের প্রশ্নমাত্র হলে সংকটের চিহ্ন কোথায়? বিপ্রতীপ প্রত্যয়ের বিরোধেই তো সংকট। এমনকালে ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার তৈলবিহীন স্তিমিত শিখা লৌকিক প্রত্যয়ের পবিত্র আগুন জ্বালাল। শিথিল, বিস্রস্ত একটি সমাজ-চেতনা কবির লৌকিক প্রত্যয়ে সমুদ্ভাসিত। ছড়া অন্যদিকে কবির নতুন লৌকিক প্রত্যয়েরও কাব্য-প্রতিভাস; ক্ষীণ সমাজচিহ্নের লঘু বিক্ষেপ তাই ছড়ায় অপ্রচুর নয়। সমাজ-সচেতনতার অন্তঃস্রোতের প্রচ্ছন্ন আভাসে ছড়া নতুন কাব্যলোকের অঙ্গীকার। তবুও প্রত্যয়ের বিরোধে কবিচিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত; কল্পলোকের প্রত্যয়ের মোহগ্রস্ত কবিচিত্তে তখনও লৌকিক প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতার প্রতিশ্রুতি কই?

যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা।
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।

নতুন ভাববস্তুর দায়িত্ব স্বীকারে কবি যেন সংশয়ী। সম্ভবত এতদিনকার প্রচলিত, লোকস্বীকৃত কবিধর্মচ্যুত হবার আশঙ্কা; এটা মোহগ্রস্ত সংস্কার-বন্ধন মাত্র। সমাজচেতনা সমৃদ্ধ ভাববস্তুর কাব্যরূপদানে ছড়ার আঙ্গিক নির্বাচনের মধ্যেও এই দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়ের চিহ্ন। ধ্বনিগৌরবে নিন্দার স্পর্শ

থেকে মুক্তির প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয় ; নতুন ভাববস্তু নাই বা প্রায় ... আঙ্গিক পরিচয় প্রসঙ্গে 'গদ্য-ছড়ার' উল্লেখ প্রয়োজন ; 'লিপিকা' যদি 'গদ্য-লিরিক' ব'লে স্বীকৃত হয়, তবে 'সে', 'গল্পসল্প'-এ রবীন্দ্রনাথ যে নব আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন তাকে 'গদ্য-ছড়া' বলতে বাধা কোথায়, অবশ্য অন্ত্যাক্ষরে মিলের ও ধ্বনিবৈচিত্র্যের অভাবে যদি 'ছড়া' হতে বাধা না থাকে। রূপকল্পের ধারণা থেকে পুনরায় ভাববস্তুর ভাবনায় ফেরা যাক।

"......অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই বলে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ করে দিলুম, এক যে আছে মানুষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পরে এল আমার ঘরে, আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা খিদে পেয়েছে।...

রাজপুত্তুরের গল্প অনেক শুনেছি ; কখনোই তার খিদে পায় না। কিন্তু এর খিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই। শুনে খুশি হলুম, খিদে-পাওয়া লোকের সঙ্গে ভাব করা সাজে, খুশি করবার জন্যে গলির মোড়ের থেকে বেশি দূর যেতে হয় না।...

সব গল্পেরই একটা আরম্ভ আছে, শেষ আছে, কিন্তু ঐ যে "এক যে আছে মানুষ" তার আর শেষ নেই।......এ তো রাজপুত্তুর নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও সখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প।" ("সে"—রবীন্দ্রনাথ)

ঐ যে "এক যে আছে মানুষ" যার আর শেষ নেই—সহজ সুরের বন্ধনে সেই চেনামহলের মানুষের অবচেতন মনের অণু-কাব্য "থাপছাড়া"-"সে"-"ছড়ায়" রবীন্দ্রমানসের অন্তিম ক্রান্তি।

সাম্প্রতিক সাহিত্য

সোভিয়েত বিজ্ঞান ও একবিংশ শতাব্দী

পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমানে সোভিয়েত বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিস্ময়কর—প্রায় চমক লাগানো! কয়েক বছর আগেও সোভিয়েত দেশে বিজ্ঞান-চর্চার সংবাদ এদেশের পাঠক সাধারণের কাছে পরিবেশিত হত খুবই কম—এত কম যে চেষ্টা করলেও কৌতূহল মিটত না। স্পুৎনিকের মহাকাশ-যাত্রার পর থেকে এ অসুবিধাটা কিছু দূর হয়েছে বলা যেতে পারে। সোভিয়েত দেশ থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান—বিশুদ্ধ এবং ব্যবহারিক—সংক্রান্ত অল্প দামের ভালো ভালো নির্ভরযোগ্য বই সাধারণ পাঠক চেষ্টা করলে সহজেই এখন সংগ্রহ করতে পারেন এবং সোভিয়েত দেশে বিজ্ঞানের নানান শাখা-প্রশাখার যে চর্চা চলেছে, যে অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারেন।

বর্তমান শতাব্দীর শেষের পঞ্চাশ বছরকে বলা যেতে পারে মহাকাশ যাত্রার বা স্পুৎনিকের যুগ। স্বভাবতই আগামী পঞ্চাশ বছর পরে বিজ্ঞানের সম্ভাব্য অগ্রগতি এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তার প্রয়োগের পরিমাণটা কি পর্যায়ে পৌছবে সে সম্পর্কে মনে কৌতূহল জাগে আর সেই কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে মিখাইল ভ্যাসিলিয়েভ (Mikhail Vassiliev) এবং সারজি গাউশেভ (Sergei Gousehev) উনত্রিশ জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সোভিয়েত বিজ্ঞানীর পরখশালায়, গবেষণাগারে ঘুরে ঘুরে আজকের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর নির্ভর করে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে মহাকাশ যাত্রা, চাঁদে বসতি স্থাপন, ওষধিবিদ্যা, শল্য-চিকিৎসা, পরিবহন,

Life in The Twenty-First Century—Edited by M. Vassiliev and S. Gouschev. Translated by R. J. Wason and H. E. Crowcroft : Souvenir Press, London 1960 (Rupa & Co., Calcutta-12) pp 231. 21 S'net :

জীব-বিদ্যা, ইলেকট্রনিক-তত্ত্ব, টেলিভিশন, র‍্যাডার, নগর-স্থাপনা, যন্ত্র-বিদ্যা প্রভৃতি বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে অগ্রগতি কি পরিমাণে ঘটতে পারে সে সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ধ্যানধারণা চিন্তা-ভাবনার কথা সংগ্রহ করে এনে বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকের কাছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশন করেছেন। বইটির মাধ্যমে আগামী দিনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অগ্রগতি সম্পর্কে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যাবে—আর এই ভবিষ্যদ্বাণী জুল ভার্নে বা এইচ. জি. ওয়েলসের ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়েও তাক লাগানো হলেও তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীর মতো অলীক কল্পনা নয়।

স্বপ্ন দেখাই বিজ্ঞানীদের ধর্ম। তাঁদের স্বপ্নটা অবশ্য আফিংখোরের এলোমেলো স্বপ্ন নয়। তাঁদের স্বপ্ন হল বাস্তববাদী যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন থেকেই জন্ম নেয় বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রকল্প আর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাচাইয়ে সেই প্রকল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সিদ্ধান্তে। সোভিয়েত দেশের সর্বোচ্চ বিজ্ঞানপরিষদের সভাপতি এ. এন. নেসমায়ানভের মতে স্বপ্ন দেখতে না জানলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে না—without dreams prospects do not exist, without dreams, the man, the scientist included, is inevitably halted. Creation is not consistent with kicking one's heels। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো, তাকে ক্লান্তিকর পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই দেওয়া। সেখানে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের মতে অদূরভবিষ্যতে মানুষকে খনিগহ্বরের অন্ধকারায় প্রাণ হাতে করে আর কাজ করতে, খনি থেকে কয়লা কেটে তুলতে হবে না। ভূ-গর্ভেই কয়লা পুড়িয়ে গ্যাস তৈরি হবে আর সেই গ্যাসকে কাজে লাগানো হবে নানা প্রয়োজনে। এতে কয়লার অপচয় আর ঘটবে না। অত্যন্ত অপকৃষ্ট, অব্যবহার্য কয়লাও কাজে লাগবে। অদূরভবিষ্যতে কয়লার রাসায়নিক শক্তিকে তাপীয় শক্তিতে পরিণত না করেই সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার বিস্ময়কর পদ্ধতি আবিষ্কার ঘটবে বলে সোভিয়েত বিজ্ঞানী পপকভের ধারণা। তাঁর মতে পারমাণবিক শক্তিকে একেবারে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করার উপায় এই সময়ে উদ্ভাবিত হবে। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই সমস্ত বিজ্ঞানের

জন্ম হয়েছে—এমনকি অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং তত্ত্বীয় বিজ্ঞানেরও। নক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোনমির উদ্ভব হয়েছে নিরাপদ নৌবাহনের প্রয়োজনে, জ্যামিতি জন্ম নিয়েছে আদিম কালের কৃষকদের আবাদি জমি মাপের চাহিদা থেকে। সোভিয়েত দেশের ধাতু নিষ্কাশন-বিদ্যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞানী আইভ্যান প্যাভলোভিচ বার্ডিনের মতে একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই প্রয়োজনের তাগিদে অত্যন্ত দুর্গলনীয় ধাতু টাইটেনিয়াম নিষ্কাশনের পদ্ধতিতে যুগান্তর ঘটবে, পারমাণবিক বিকীরণের নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগে কাঁচা লোহা থেকে সরাসরি বিভিন্ন জাতের উন্নত ধরনের ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হবে।

দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের বাধা অতিক্রম করে প্রেয়সী সিরিনের কাছে পৌছবার জন্য রূপকথার ফারহাদকে (Farad) যেমন দিনের পর দিন হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে পাথর ভাঙতে হয়েছিল—ভবিষ্যতের মানুষকে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার জন্য সময় আর শ্রমের পর্বততুল্য বাধা অতিক্রম করতে হবে না। বিস্ফোরণবিশারদ, সুরকার ও নিসর্গচিত্র শিল্পী পোক্রোভস্কির ধারণায় ভূ-গর্ভে নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে পাহাড়কে পাহাড় উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যবর্তী দুর্গম পর্বতমালার বর্তমান নৈসর্গিক বাধা দূর করে উভয় অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকতর আন্তর্জাতিক সংযোগ সৌহার্দ্য গড়ে তোলার তাগিদে নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে রেলপথ তৈরি করা হবে। চীনে বাওৎজিন থেকে চেণ্ডু পর্যন্ত দুর্গম পার্বত্য রেলপথ তৈরি করার সময় একটি আঁকা-বাঁকা পার্বত্য নদীর পথকে সোজা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। চৈনিক বিজ্ঞানীরা সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সহায়তায় নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি নূতন নদী খাত তৈরি তো করলেনই উপরন্তু পূর্ব নির্ধারিত হিসাব অনুযায়ী সেই সঙ্গে দুটি সুন্দর রেলপথও করে নিয়েছেন। ল্যাং চাউয়ের কিছু উত্তরে ১৯৫৬ সালের শেষে ভূ-গর্ভে লৌহ আকরিকের বিপুল সম্ভারের সন্ধান চৈনিক বিজ্ঞানীরা পান। তখন বিরানব্বই শো টন অ্যামোনিয়ম নাইট্রেটের নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভূ-গর্ভস্থ লৌহ আকরিকের ওপরকার সমস্ত মাটি কয়েক সেকেণ্ডে উড়িয়ে দেওয়া হল। এই মাটি কেটে স্বাভাবিকভাবে লৌহ আকরিকের কাছে পৌছতেই লেগে যেত বছরখানেক। ভবিষ্যতে রাসায়নিক বিস্ফোরকের বদলে বিদ্যুৎ-

বিস্ফোরকের ব্যাপক প্রচলন ঘটবে বলে পোক্রোভস্‌কির ধারণা। প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুতের সাহায্যে কঠিনতম পাথরকে গুঁড়িয়ে দেবার যন্ত্র ইতিমধ্যেই সোভিয়েত দেশে তৈরি হয়ে গেছে। আগামী কালে এই ধরনের যন্ত্রের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হবে এবং প্রয়োজন হলে পামীর কিংবা হিমালয় পর্বতমালা ভেদ করে সুড়ঙ্গ কাটা বা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ভারত থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত রাস্তা বা রেলপথ তৈরির সময় এই যন্ত্রোৎপাদিত বিদ্যুৎ-শক্তিকে পাথর ভাঙার কাজে লাগানো অবাস্তব হবে না বলেই সোভিয়েত দেশের প্রখ্যাত বিদ্যুৎবিশারদ ইলিচ বাব্যাটের (Babat) বিশ্বাস। হাইফ্রিকোয়েন্সি বিদ্যুৎ-প্রবাহের অন্যতম প্রয়োগের উল্লেখ করতে গিয়ে বাব্যাট ত্রিশ-চল্লিশ বছরে স্ট্যালিনগ্রাদের বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বারো থেকে পনেরো মাইল উপরে কৃত্রিম সূর্যালোক সৃষ্টি করে মস্কোর আর তার চারপাশের আকাশকে আলোকিত করার কথাও বলেছেন। বাব্যাট কেবল বিদ্যুৎবিশারদই নন— একজন নামকরা সাহিত্যরসিক এবং ঔপন্যাসিকও বটে।

কেবল যন্ত্রশিল্পেই নয় আগামী পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যেই কৃষি, চিকিৎসা ও জীব-বিদ্যারও অভাবনীয় উন্নতি ঘটবে বলে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ধারণা। সোভিয়েত দেশের নামকরা জীব-বিজ্ঞানী এঙ্গেলহার্ট (V. A. Engelhardt) আমাদের কাছে অপরিচিত নন। কয়েকবার তিনি এদেশে এসেছেন। তাঁর মতে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ক্যানসার নিরাময়ের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে এবং বর্তমানে বসন্ত, ম্যালেরিয়া এবং ডিপথিরিয়াকে যেমন আয়ত্তে এনে এদের বিলুপ্তির পথে এগিয়ে দিয়েছেন তখন ক্যানসারকেও তাঁরা সেইভাবে আয়ত্তে আনবেন। ক্যানসারের ভয়ে তখন মানুষকে আর ভুগতে হবে না। অবিরাম ক্লান্তিকর পরিশ্রম এবং উদ্বেগের ফলে মস্তিষ্কে বিষ-সঞ্চারের হাত থেকেও মানুষ উদ্ধার পাবে। মাথায় বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ-স্পন্দনের প্রয়োগে পরিশ্রম ও উদ্বেগজনিত মস্তিষ্কক্ষয় নিবারিত হবে। তখন ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আট ঘণ্টার ঘুমের প্রয়োজন মিটবে। ক্লান্তিকর অঙ্ক-কষার হাত থেকেও মানুষ উদ্ধার পাবে, স্মৃতিশক্তির অপচয়ও আর ঘটবে না। এক নাগাড়ে দিন রাত্রি খেটে যে অঙ্ক-কষতে মানুষের বারো বছর লাগত অঙ্ক-কষা যন্ত্রের সাহায্যে সে অঙ্ক এখন এক ঘণ্টায় হয়ে যায়। অ্যাটম বোমা আর স্পুৎনিকের অঙ্কও মানুষ

আর মাথা খাটিয়ে কষে না, অঙ্ক-কষা যন্ত্রেই করে। আগামী দিনে এই ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটবে তখন হাজার সমস্যায় জট পাকানো জটিলতম অঙ্ক-কষতে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র লাগবে। মানুষকে তখন আর মনে রাখতেও হবে না। মানুষের হয়ে যন্ত্রই মনে রাখবে। মনে রাখা আর অঙ্ক-কষার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে মানুষ তখন তার মাথা খাটাবে নূতন নূতন উদ্ভাবনী পদ্ধতি আবিষ্কারের চিন্তায়। মানুষের আয়ুও বাড়বে। এঙ্গেলহার্টের মতে রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা বা অঙ্ক-বিজ্ঞানের মতই অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা জীববিদ্যাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনতে সক্ষম হবেন, তখন জীব-বিদ্যা যথা-নির্দিষ্ট বিজ্ঞানে (Exact Science) পরিণত হবে।

আলোচ্য বইটির যে অধ্যায়ে সোভিয়েত দেশের পরীক্ষামূলক শল্য-চিকিৎসাগারের অধ্যক্ষ মিখাইল আনানিয়েভ (Ananiev) চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতির সম্ভাবনার বর্ণনা দিয়েছেন সেই অধ্যায় সবচেয়ে চমকপ্রদ। বর্তমানে সোভিয়েত দেশে যেখানে এই ধরনের চিকিৎসাগার একটি কি দুটি মাত্র আছে আগামী পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পাড়ায় পাড়ায় এই ধরনের চিকিৎসাগার স্থাপিত হবে বলে আনানিয়েভের দৃঢ় বিশ্বাস। এই চিকিৎসাগারের রোগীরা বিছানায় শুয়ে শুয়েই বোতাম টিপে জানালার পর্দা ওঠাতে নামাতে, আলো জ্বালতে নেবাতে, পাখা …ঘার রেডিয়ো চালাতে বন্ধ করতে, বালিশ ঠিক করতে, খাট ওঠাতে নামাতে পারবে। রোগীর পাশের ঘরে থাকবে নার্স। সে প্রায় এক জন টেলিভিসনের পর্দায় প্রায় হাল ছেড়ে-দেওয়া রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, বৈদ্যুতিক থার্মোমিটারে রোগীর দেহের তাপমাত্রা আর স্পন্দন-মাত্রিক যন্ত্রে নাড়ীর গতির ওপর নজর রাখবে। ডাক্তার অ্যাম্প্লিফিয়ারের মাধ্যমে বিনা স্টেথস্কোপে রোগীর হৃদ্‌স্পন্দনের আওয়াজ শুনবেন, স্বয়ং-ক্রিয় রোগ-লক্ষণ-নির্বাচনী যন্ত্রের সাহায্যে রোগনির্ণয় করবেন। যন্ত্রই তাঁকে রোগের লক্ষণ থেকে বলে দেবে কি কি রোগ হওয়া সম্ভব। তখন তিনি প্রয়োজন হলে বিনা রক্তপাতে ছুরি চালাবেন। অস্ত্রপ্রয়োগের পর ক্ষতস্থান সঙ্গে সঙ্গে সেলাই করার, জোড়বার ব্যবস্থা হবে যন্ত্রের সাহায্যে। রোগীকে অচেতন করার জন্য, ঘুম পাড়ানোর জন্য তিনি প্রয়োগ করবেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ। রোগীর যকৃতে পাথর থাকলে তখন আর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনই হবে না।

শ্রবণান্তিক ধ্বনি তরঙ্গের (supersonic waves) সাহায্যে সেই পাহাড়… ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলো করে ফেলা হবে।

সোভিয়েত জীব-বিজ্ঞানী জেব্র্যাক (Jebrak) আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মানুষ তার কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের ব্যাপারে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতাকে সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারবে বলেই বিশ্বাস করেন। তখন জীব-কোষের বংশানুক্রমবাহী ক্রমোসোমদের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে … ইচ্ছানুযায়ী নূতন নূতন ফসল সৃষ্টি করবে। শর্করোৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটবে অভাবনীয়ভাবে। বৃদ্ধি ও পুষ্টিসহায়ক হর্মোনের ব্যাপক প্রয়োগে চিরতুষার অঞ্চলে জলহীন, তৃণহীন রুক্ষ মরুপ্রান্তরে বিপুল পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ, কৃষি সম্প্রসারণের ফলে খাদ্যোৎপাদন হবে প্রচুর পরিমাণে।

ভূ-গর্ভের তাপ থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদন, চাষের কাজে গরম জল প্রয়োগ করে ফসল বাড়ানো, সামুদ্রিক খাদ্যসম্ভারের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে অদূর ভবিষ্যতে যুগান্তর ঘটবে বলে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ধারণা। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে ছায়াচিত্র, ফটোগ্রাফী, বিমান ও ট্রেন চলাচল, নগর-পরিকল্পনা, মটরগাড়ি, বিদ্যালয় কি হবে সে সম্পর্কে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ধারণাও বইটিতে হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সময়ে মহাকাশ যাত্রার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটবে আর তখন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের তাগিদে চাঁদে বসবাসযোগ্য নগরও গড়ে উঠবে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। এই রকম একটি শহর ভ্রমণের বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা বইটিতে আছে।

উনত্রিশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত বইটি পড়তে পড়তে ভাবীকালের বৈজ্ঞানিক উন্নতির অগ্রগতির সম্পর্কে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণার কথা পড়ে পাঠকের মন নিশ্চয়ই চলে যাবে আনন্দময় এমন এক স্বপ্নলোকে যেখানে সংঘর্ষ নেই, দারিদ্র্য নেই, জরা নেই—যে স্বপ্নলোকে বিশ্বরহস্যের … উন্মোচনে, প্রকৃতি-বিজয়ের সাধনায় প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা মানুষ সত্য সত্যই … অমৃতের পুত্র।

বইটির অনুবাদ আরও সাবলীল হওয়া উচিত ছিল। টন-মাইল-হর্স… পাউণ্ড, মিটার-গ্র্যাম-সেন্টিমিটার এই দুই ধরনের মানের ব্যবহার দুই-এক জায়গায় (৩৯ পৃঃ ও ৪৮ পৃঃ) অসুবিধা ঘটিয়েছে। ভবিষ্যতে এই অসুবিধা দূর হবে আশা করি।

পুস্তক-পরিচয়

নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ ॥ প্রমোদ সেনগুপ্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। চার টাকা॥

লাঙলের পিছনে যে মানুষটি জলে ভিজে রোদে পুড়ে কাজ করেন আধুনিক ঐতিহাসিক তাঁকে আবিষ্কার করেছেন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা আজ স্বীকৃত। শুধু কয়েকজন বীর চূড়ামণির কার্যকলাপ এবং মতবাদের মূল্যায়ন নয়, জাতীয় আন্দোলনে কৃষকের ভূমিকা আধুনিক ঐতিহাসিকের আলোচ্য বিষয় হবার মর্যাদা পেয়েছে। কৃষক আজ কৌলীন্য লাভ করেছে। এই সব মূক মানুষেরা জাতীয় আন্দোলনের কোনো কোনো পর্বে, বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে যখন বিদ্রোহের মধ্যে মুখর হয়ে ওঠে, তখন সেই ঘটনাকে উপেক্ষা করে ঐতিহাসিক মূক থাকবেন কেন? খুব আশার কথা, আধুনিক ঐতিহাসিক প্রাক্-কংগ্রেসী যুগের কৃষক-বিদ্রোহের ঘটনাকে অস্বীকার করছেন না। যতদূর জানি এ বিষয়ে প্রথম পথ দেখান ডাঃ কে. কে. দত্ত। সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর প্রামাণিক বই (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) পণ্ডিত মহলে আদৃত হয়েছে। নীলচাষের অর্থনীতি এবং "নীল বাঁদর"-দের অত্যাচার সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য ডাঃ সিংহ (Economic History of Bengal, পৃঃ ১৯৫—৯৯) এবং ডাঃ ত্রিপাঠি (Trade and Finance in the Bengal Presidency, পৃঃ ১৩৬, ১৯৬, ২১০) উপস্থিত করেছেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের পুস্তিকার কথাও অনেকের মনে পড়বে। উনিশ শতকের কৃষক-বিদ্রোহগুলির একটি প্রামাণিক ইতিহাস অদূর ভবিষ্যতে রচিত হবে—এ আশা আমরা রাখি। চিন্তার বন্ধ্যতা কাটিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিক দেশের মজুর-কৃষকের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলনের কথা নিয়ে নয়া ইতিহাস কেন লিখবেন না? ইউরোপের পণ্ডিত সমাজ জার্মানি এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কৃষক-বিদ্রোহের যে গুরুত্ব দিয়েছেন

তা আমাদের জানা থাকবার কথা। ওয়াট টাইলারের কাহিনী কলেজের ছাত্রদেরও পড়তে হয়।

নীল-বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত "নীল-বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ" বই লিখে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নীল-চাষের অর্থনীতি, নীল-চাষীর অভ্যুত্থান, বাঙালী সমাজে এই উপলক্ষে আলোড়ন, হরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, শিশিরকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন প্রধানত উনিশ শতকে প্রকাশিত বইগুলি এবং সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে। রেকর্ডস দেখবার সুযোগ সম্ভবত তাঁর হয় নি। এই বই প্রামাণিক বলে আদৃত হবে কি না জানি না, তবে সাধারণ পাঠকসমাজে এই বই সমাদর লাভ করবার দাবি রাখে। বিশেষ করে "নীল-চাষের অর্থনীতি" এবং "হরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র" অধ্যায় দুটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিশিষ্টে দ্বারকানাথ ঠাকুরের চিঠি, রামমোহন রায়ের বক্তৃতা, "হিন্দু পেট্রিয়ট" থেকে উদ্ধৃতি, ইণ্ডিগো কমিশনের রিপোর্টের কিছু অংশ সংযোজিত হয়েছে। নীল বিদ্রোহের ছেঁড়া ছেঁড়া কাহিনী একত্র সন্নিবদ্ধ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাও সম্ভবত শ্রী সেনগুপ্তই প্রথম করেছেন।

লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও তাঁর বইয়ের কিছু ত্রুটি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। এই বইয়ে অসংখ্য অসাবধান উক্তি আছে যা বর্জিত হলে বইটির অঙ্গহানি হত না, কিংবা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দুর্বল হত না। তাঁর কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করছি: "মধ্যযুগে ইউরোপে সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—একধারে সামন্ত জমিদাররা আর একধারে ভূমিদাসরা। ক্রমে আর একটি শ্রেণী জন্মলাভ করে, যাকে ইউরোপীয়নরা বলে বুর্জোয়া ও ইংরেজরা বলে মিডল ক্লাস" (পৃঃ ১১৬); "সিপাহী-বিদ্রোহ ও নীল-বিদ্রোহের ঢেউ বাংলায় এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল যার ফলে, জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, জনসাধারণের বিদ্রোহের মর্মবাণী নিয়েই রচিত হয়েছিল বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্য" (পৃঃ ১২১); "নীল-বিদ্রোহ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ বিদ্রোহ ১৮৫৭-র ভারতব্যাপী মহা-বিদ্রোহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত" (পৃঃ ১৪৫); "শিক্ষিতদের সহানুভূতিটা (নীল-বিদ্রোহের প্রতি) ছিল বিশেষভাবে মৌখিক। কার্যক্ষেত্রে তা বিশেষ কোনো রূপ নেয় নি" (পৃঃ ১৪৮)।

নীল-বিদ্রোহের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সমর্থনের ঘটনা অতি সুবিদিত হওয়া সত্ত্বেও, কি কারণে লেখক তার মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত তা বোঝা দুঃসাধ্য।

প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার এই বইয়ে নীলচাষীর অভ্যুত্থানের অধ্যায়টি মাত্র বারো পৃষ্ঠা স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়টি আর একটু বড় করে লিখলে বোধহয় ভাল হয়। নীল-চাষীর খাজনা বন্ধ আন্দোলন এবং রেণ্ট অ্যাক্ট (১৮৫৯) আলোচনা থেকে বাদ পড়েছে।

সুনীল সেন

রৌদ্রধারা ॥ কনক মুখোপাধ্যায়। প্রতিশ্রুতি। দু টাকা ॥

ঝর্ণার পাশে শুয়ে আছি ॥ সমীর রায়চৌধুরী। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। দেড় টাকা ॥

দর্পণে অনেক মুখ ॥ পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। দু টাকা ॥

শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'রৌদ্রধারা'য় একটি মৃদু সরলতা অনুভব করলাম। গ্রন্থে সংকলিত মোট বিয়াল্লিশটি কবিতার রচনাকাল উনিশশো ছাপান্ন থেকে ষাট সালের অন্তর্বর্তী সময়।···রচনার পিছনে 'নিজের তাগিদ' প্রধান হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় সেগুলিকে 'দেশের দশের কাজে' নিয়োজিত হতে দেখলে 'সার্থক' মনে করবেন, এটি জানিয়েছেন (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

প্রথমেই বলা যায়, আধুনিক কবিতার প্রচলিত স্বাভাবিকতা ও বাচনশৈলী এই গ্রন্থটিতে অনুপস্থিত। কিন্তু তদর্থে পার্থক্যটুকু মাত্র দুর্বলতায় ভরাট নয়। বরং আধুনিক কাব্য-প্রেক্ষিতে এ-সংকলনটির চরিত্রগত অন্তঃস্রোত প্রায় সমান্তরাল।···বঞ্চনা ও অব্যবস্থার প্রতিবাদ 'রৌদ্রধারা'য় সর্বত্রই খুব স্পষ্ট, এবং যেহেতু সেগুলি সাদা-মাটা কণ্ঠে উচ্চারিত সুতরাং সহজ আবেগের প্রাধান্য একটু অধিক মনে হয়। প্রথম কবিতাগ্রন্থ জেনে রেখে বিচার করলে. কিছু কিছু অংশ অবশ্যই প্রশংসার, যেমন—

চোখে চোখে চকমকি জ্বালিয়ে
যতটুকু আলো হয় তাই সই
তারাহারা রাত্রির আকাশে
আলোময় স্বপ্নের যাত্রার
এ লগ্ন চলে যেতে দিও না। (লগ্ন)

কিংবা,

মাটির পৃথিবী প্রাণের তুফান যখন তুললো শূন্যে
তখন দূরের আকাশে আমার মনের আকাশে সন্ধি।
(দুটি আকাশ

ভাবনার জটিলতা কবির বক্তব্য নয়; নানা বিরুদ্ধ পরিবেশের অভ্য নিঃশেষ হয়ে-যেতে-থাকা আধুনিক মানুষের অবশিষ্ট শ্বাসক্রিয়াটুকুর উজ্জীব কামনায় এই গ্রন্থের প্রায়-কবিতাই আর্দ্র। সরল ভাবাবেশে কোনো-কোন রচনা পদ্য জাতীয় হয়ে গেলেও, তা মানবিক সুষমায় মণ্ডিত, স্বীকার কর কিন্তু বাধ্যতই জানাচ্ছি, কনক দেবীর ছন্দে-লেখা কবিতাগুলি আরো রচিত হলে আবেদন সম্পূর্ণ হত (উদাহরণঃ রবীন্দ্রনাথ, কবিতা ইত্যাদি)। ছন্দের কবিতায় মাত্রার মতোই গুরুত্বপূর্ণ তার ধ্বনিমাধুর্য এবং ক্ষেত্রবিশে মাত্রার দুর্বলতা ঢেকে দিতে পারে দক্ষ শব্দস্থাপনের যোগ্যতা। এদিকে কবি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'রৌদ্রধারা'র গদ্য কবিতাগুলিতে, অতি-কাব্যিক ভা ও বাক্যর মধ্যস্থলে ক্রিয়াপদ ব্যবহার সমর্থন করি না। ওখানে কবি সচেতনতা প্রার্থনীয়। সর্বোপরি কবিতাগুলির গ্রন্থনা রচনাকাল অনু সন্নিবেশিত হলে কবির ক্রমপরিণতি অনুধাবন করা যেত, তা না হওয়া পারম্পর্যের বিচারে রচনার মান অবিন্যস্ত লাগল। নচেৎ, 'রৌদ্রধারা' উদ্দেশ্যে উল্লেখ্য সততা আছে।...অঙ্গ সজ্জায় গ্রন্থটি উপহারযোগ্য।

এরপর আলোচ্য 'ঝর্ণার পাশে শুয়ে আছি'। কবি শ্রীসমীর রায়চৌধুরী 'সর্বক্ষণ চিন্তায়, অস্তিত্বে এক অদৃশ্য ঝর্ণার অবিরল শব্দ' (বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে) শ্রীরায়চৌধুরীর কাব্যরচনায় প্রধান প্রেরণা। এখন এই ধূসর জীবনযাপনের নাগরিক আচ্ছন্নতার ভিতর 'ঝর্ণার পাশে শু আছি'-র কল্পনা স্বাভাবিক কারণেই মনোজগতে একটি Phantasmag

সৃষ্টি করে। সমীরবাবু তাঁর কবিতায় সেই মুড্ আনবার চেষ্টা করেছেন। অংশত তিনি সার্থক, তা গ্রন্থটির প্রথম কবিতাতেই স্পষ্ট—

মৃত শালিকের শব হাতে তুলে' বিস্মিত বালিকা—
অযুত যুগের এক চলমান নির্ঝরিণী খোঁজে।
অথচ সে-কিশোরীর রক্তে আসে ধূসর স্রোতের চূর্ণ জল
একদা বিলীন হ'তে, পুরাতন শালিখের বেশে।

* * *

পৃথিবীও মেরুদণ্ডে হেলে আছে, আকাশের ধূসর বাগানে।
(স্বচ্ছ নির্ভরতা)

এই কবির লেখা পূর্বে বিশেষ পড়ি নি, সুতরাং একেবারে আকস্মিকভাবে এঁর পরিণত আবির্ভাব আমাকে বিস্মিত করেছে। জীবনানন্দ দাশের প্রচ্ছন্ন প্রভাব থাকলেও, সংকলনটির পিছনে অন্তরালবর্তী অজ্ঞাতবাসের একনিষ্ঠ সাধনা রয়েছে, যা অভিনন্দনযোগ্য।...প্রসঙ্গত, কয়েকটি কবিতা: মন্থিত স্পন্দন, উৎসবে কে তুমি একা, প্রত্যাখান নয়, শ্বেত কণিকা ইত্যাদি গ্রন্থটির মেজাজ রক্ষা করতে পারে নি, মনে হল। তদুপরি—ব্যামো, কাচুমাচু, হাঁটুগুড়ি, কুঁদে মাতাল নদী জাতীয় বাকভঙ্গি অস্বস্তিকর। ছন্দের দিকে তাঁকে আরো সাবধান হতে অনুরোধ করব (বিজন এ কীটপাখি, দুর্লভ এ পয়ারের শিথিলতা লক্ষণীয়)। 'বিগত সন্ধ্যার বন্ধ ডাকে' কবিতাটি ভালো লাগল। 'ঝর্ণার পাশে শুয়ে আছি' আধুনিক কবিতায় একটি সময়োচিত সংযোজন।

শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায় বোধ করি এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। 'দর্পণে অনেক মুখ' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। রচনাকাল ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০। গত দুই বছরে রচিত তিপান্নটি কবিতা এখানে অন্তর্ভুক্ত।...স্মৃতিমুখরতা, অসহ জীবনাবেগ এবং দর্শনউদ্ভূত 'বিচিত্র দুঃখের' ভিতর-বাহিরে সুদূর এক শান্তির সন্ধান কবিতাগুলির মূল উপজীব্য।

শ্রীমুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ অর্থে আধুনিক। কেননা তিনি সাম্প্রতিক ভারসাম্য-হীন সামাজিক মহাকর্ষে আন্দোলিত। যার ফলে, কবিসুলভ হৃদয়বৃত্তি দ্বারা সম্মোহিত অবস্থায় কখনো তিনি মৃত্যু বা অন্ধকারকে পরিদর্শয়িতা বলে মনে

করেন এবং 'কণ্ঠের সুতীব্র বিষে' আর কোনো 'আশার সংগীত' বাজিয়ে
সম্ভব কি না ভাবেন (বিষণ্ণের আর্তি), আবার অলক্ষ্য কারণে 'অ
সমস্ত সংসারে' 'মায়ের স্নেহের' নির্ভরে 'ছয় ঋতুর নৃত্যে' জীবনকে
উঠতে দেখেন (নতুন প্রত্যয় থেকে)। তাঁর 'বাঞ্ছিত মরণ'কেই 'প্রা
দূরে রাখতে' চান (রবীন্দ্রনাথ) কিন্তু 'অন্ধকার ভালোবেসে' (?);
নায়িকার প্রতি অগাধ বিশ্বাসে বলে ওঠেন : মরা ডালে শুধু তুমিই ফোটা
পারো / অজস্র ফুল সময়ে কী অসময়ে (তুমি)। কথাটা মনে হল
শ্রীমুখোপাধ্যায় সাম্প্রতিক বেঁচে-থাকার কুটিল বক্র ধাঁধায় একটু বেশি বিপর্য
কেননা তিনি বোধ করেন,

> অজস্র ক্ষতের চিহ্ন বুকে নিয়ে অস্থির আলোতে
> কথনো দেখো না প্রেম প্রসন্ন প্রত্যয় যেন নদী
> কুটিল ঘূর্ণিতে আর অবিচ্ছিন্ন স্রোতে-প্রতিস্রোতে
> আমার মায়ের মুখ প্রচ্ছন্ন ব্যথায় একাকার।

(ঈশ্বরের প্রতি

অথবা, যৌবনপ্রার্থনায় তাঁর গভীর অনাসক্তি—

> সোনার হরিণ চাস ? সেও তো মৃত্যুর হাতে নিয়ন্ত্রিত আলো।
> পদ্মের পাতায় জল যাদুকর দক্ষ হাওয়া নিশ্চিত নিয়তি।

(কে তোকে যৌবন দেবে

উপরে আলোচিত বাক্যাংশে (ঐ শ্রেণীভুক্ত অন্য কবিতাগুলির কথা
বলছি), পবিত্রবাবুর অস্থিরতা অধিক প্রবল, কেন ? কবি 'বয়সের স্বধর্মে
কথা বলেছেন, কারণটা কি তাই ? কিন্তু তাঁর তো জানা উচিত যে, পরস্পর
বিরোধী উক্তি পাঠকের অনুধাবন ক্ষমতাকে বিভ্রান্ত করে। এবং যার জন্য
পাঠক আদৌ দায়ী নন। অথচ তিনি যখন সুন্দর করে বলেন—

> জীবনকে ভালোবেসে নিরঙ্কুশ ক্ষয়ে যেতে পারি
> সম্ভ্রান্ত শান্তিতে গেঁথে আলোকিত মুহূর্তের মালা।

(কাকে যে প্রেমিক বলি

তখন তাঁর অন্যান্য কবিতার অস্থিরতা বিস্ময়করভাবে অপটু লাগে। প্রসঙ্গত
সুতরাং, বন্ধুজনোচিত আগ্রহে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে আরো একটু নিবো
স্থিরতায় আমন্ত্রণ করি। অপর দিকে তাঁর হাত দক্ষ ও পরিকার। কবি
অধিকাংশই পয়ারে, দু-একটি মাত্রাবৃত্তে রচিত। ছন্দের জ্ঞান প্রশংসনীয়

শব্দব্যবহারকে 'এবং' 'যেহেতু' প্রভৃতির প্রতি অহেতুক ঝোঁক না থাকলেই ভালো ছিল। সুধীন্দ্রনাথ এবং কয়েকজন তরুণ কবির প্রভাব তাঁর কবিতায় লক্ষণীয়, তবু শ্রীমুখোপাধ্যায় একটি পৃথক নিজস্ব কণ্ঠে কবিতাগুলি উপস্থিত করেছেন। 'দর্পণে অনেক মুখ' অনেকাংশে খুবই অভিনবত্বের অধিকার রাখে। মুদ্রণ ইত্যাদিতে গ্রন্থটি পরিপাটি।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য দৃষ্টি ॥ প্রশান্তকুমার রায়। পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। চার টাকা

প্রশান্তকুমার রায় সাহিত্যদৃষ্টি প্রবন্ধের বইয়ে সমাজ সাহিত্য বিপ্লব সাহিত্যজিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্য বৈষ্ণবপদাবলীর ওপর সামান্য ছোট ছোট আলোচনা করেছেন। সামান্য বলছি এই কারণে, তাঁর প্রতিটি বিষয়বস্তু নিয়ে দীর্ঘায়ত প্রবন্ধে বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল। কিন্তু তাতে তিনি যত্নবান না হয়ে শুধু নিজের বক্তব্যগুলিকেই প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থের চারটি ভাগের মধ্যে দ্বিতীয় ভাগটিই আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। শিল্পী কি সমালোচক, শিল্পীচেতনার অভিব্যক্তি, শিল্পীমানস ও ব্যক্তিত্ববাদ, সাহিত্যপ্রেরণাবাদ, আবেগ, সাহিত্যজীবন ও সৌন্দর্য, সাহিত্য-সৌন্দর্য ও আনন্দ, সাহিত্য চোখের দেখা ও মনের দেখা, সাহিত্যশিল্পশ্রী—এই পর্যায়ভুক্ত। পূর্বেই বলেছি প্রবন্ধগুলি ছোট, আলোচনা বা বিশ্লেষণের পরিসর একেবারেই নেই এবং একই কথা অন্য প্রবন্ধে বারংবার এসেছে। তা সত্ত্বেও প্রশান্তকুমার রায় যে দৃষ্টিতে সাহিত্যজিজ্ঞাসার রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন, তা বৈজ্ঞানিকের না হলেও যুক্তিবাদীর। "সাহিত্যকে সত্যময় করে তুলতে গেলে আনন্দলোকের কথা স্মরণে রেখে বস্তু, ভাব ও সেই রসরূপের মধ্য দিয়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে যার ফলশ্রুতি মানবমনে সত্য, সুন্দরে শেষ না হয়ে আনন্দে সার্থকতা লাভ করবে।" এ অতুলচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যজিজ্ঞাসারই প্রতিধ্বনি, এলিয়ট Social Function of Poetry প্রবন্ধেও সেই একই কথা বলেছেন, The first, I think, that we can be sure about is that poetry has to give pleasure। সাহিত্যদর্পণেও অখণ্ড চিন্ময় আনন্দের ফলশ্রুতি শুনতে পাই।

কিন্তু প্রশান্তকুমার রায় যেখানে সাহিত্যের উপেয়কে বাদ দিয়ে উপায় নিয়ে একটি জোরালো মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সেখানেই তাঁর সাহিত্যজিজ্ঞাসার সঙ্গে আমার মতের মিল সবচেয়ে বেশি। শুধু সত্যকে উদ্ঘাটন করাই শিল্পকর্মের পরাকাষ্ঠা নয়, সেই সত্যের সঙ্গে কল্যাণের মিলন না ঘটলে তা অতিব্যবহারে বিষক্রিয়া সঞ্চার করতে পারে, কল্যাণের সঙ্গে সৌন্দর্যের এবং সৌন্দর্যের সঙ্গে আনন্দের আত্মীয়তা আছে।

কিন্তু এই আনন্দেরও পরপারে রস অনুভূতি লুকিয়ে আছে। এলিয়টের দেশে রস শব্দের সংস্কার নেই, যদি থাকত, তাহলে কোলরিজের আলোচনা থেকেই তিনি তা গ্রহণ করে নিতে পারতেন। আনন্দের মধ্যে সাদৃশ্য সামঞ্জস্যজনিত আনন্দের বৌদ্ধিক ক্রমপরম্পরা লুকিয়ে আছে, কিন্তু এই বুদ্ধিকেও অতিক্রম করে যখন সকল বিশ্ববেদনার সঙ্গে মানবমনের একাত্ম অনুভূতি প্রেমিকের আলিঙ্গনের মতো, ফুলের গোপন গন্ধের মতো, নিশীথ রাত্রির প্রকৃতির রূপের মতো আমার সমস্ত মন ও হৃদয়কে মোহিত বিস্মিত স্তব্ধচৈতন্যে নিয়ে যায়—সেখানকার অনুভূতি যে শুধু ঐ আনন্দ শব্দটির মধ্যে প্রকাশ করা যায় না। রস শব্দটি যে বিভ্রান্তিকর, এতে কারো সঙ্গে দ্বিমত নেই, কিন্তু রসের বেদনার ছোঁয়া মনে এলে সমগ্র বিশ্ব অন্তরাত্মার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের অদ্বৈত সত্তা জাগ্রত হয়।

শিল্প-আলোচনায় অনেক ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে অবশ্য মনে রেখে আলোচনা করতে হবে। যে শিল্প প্রত্যক্ষ বস্তুজগৎ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সাহিত্যসৃষ্টিতে মন নিয়োজিত করে, তার মধ্যেই মহৎ সাহিত্যের বীজ লুকিয়ে থাকে। বেঁচে থাকার এই বাস্তববোধের মধ্যে শিল্পের সৌন্দর্য অনুপ্রবিষ্ট হলেই তার স্থায়িত্ব চিরকালের। কেননা, প্রত্যেক যুগের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বেঁচে থাকার জন্যে তার মধ্যে তার একান্ত আদিম সত্তাটিকে চিরজাগ্রত করে রাখার চেষ্টা রয়েছে. সৌন্দর্যের রূপ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু এই সৌন্দর্যের অন্তর গভীরে যে শাশ্বত বেদনা ঐশ্বর্য মুক্তি রয়েছে—তাই চিরকালের মানুষের কাছে বিশেষকালের মানুষের রূপকে নিত্য জাগরূক করে রাখে। যে শিল্পে এমন বাস্তবতা প্রত্যক্ষত ফুটে দেখা দেয় নি, অথচ শিল্পকর্মের আনন্দ মনকে ব্যাকুল করছে, তাকে কি ক্ষুর সাহিত্য থেকে বর্জন করতে পারি! সেখানে শিল্পীর মনই হয়ে

যাত্রব, সে তার আন্তরিক অনুভবকে অন্যের আন্তরিকতার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যশিল্পও আলোচ্য। বোদলেয়ারের কবিতার মর্মজ্ঞতা পৃথিবীর সমস্ত সুধীজনের কাছেই স্বীকৃত, তাঁর আত্মিক অনুভূতিকে নিরাবরণ করার মধ্যেই বেদনবীণার তার ঝঙ্কৃত হয়েছে। সকলের হৃদয়ে আঘাত করেছে। কিন্তু ঐ শিল্পধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই দেখা যায়, বাইরে যার জন্যে সহানুভূতিতে কাতর হয়ে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলুম—ভেতরে দেখি সে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগী। রূপোপজীবিনীর বাইরের আনন্দরূপ মূর্তির একটা চিরায়তিক আত্মিক আকর্ষণ আছে, সে শুধু নিষিদ্ধের দিকে মন যায় বলেই নয়। ঐরকম রূপবেদনা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সংগুপ্ত স্তরে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু রূপোপজীবিনীই কি আমাদের জীবনের পরাকাষ্ঠা! কবি বা শিল্পী তাঁর রাসায়নিক মনে ভালো বস্তু বা জঞ্জাল নিয়েও আমাদের আস্বাদনযোগ্য বস্তু তৈরি করে দিতে পারেন, আস্বাদন করার পর যেন মদের তীব্র নেশার মতো, আফিমের বা গেঁজেলের মতো স্তব্ধ করে না দেয়—এই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বোদলেয়ারের কবিতায় আফিমখোরের আনন্দস্তব্ধতা অনস্বীকার্য, কিন্তু জীবনের কল্যাণের বা পুষ্টির দিক থেকে আলোচনায় দেখতে হবে শিল্পী তাঁর উপায়রূপে এই মর্ত্য-জীবনদর্শনকে কতখানি জারক রসে পরিশ্রুত করে নিতে পেরেছেন। সাহিত্য হৃদয়ের ব্যাপার, সে হৃদয় মানুষের, অন্য কারো নয়। ঠিক এই কারণেই যখন কোনো দর্শনের অধ্যাপক বা হতভাগ্য সন্ন্যাসীরা কাব্যানন্দ ব্রহ্মানন্দ নয় বলে আক্ষেপ করে, তখন তাঁদে বুদ্ধিমত্তায় আমার বিতৃষ্ণা জন্মে। সাহিত্য আনন্দতীর্থে পৌছয় বটে, কিন্তু সেই আনন্দ বুদ্ধিঅতিক্রান্ত, বুদ্ধিশূন্য নয়। কিন্তু সাহিত্য আলোচনায় বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এই ভিন্নতর আনন্দের আলোকপাত হওয়া দরকার।

প্রশান্তকুমার রায়ের বইয়ের অন্যান্য খণ্ডের আলোচনা মামুলি ধরনের। এই মামুলি ধরনতাকে অতিক্রম করে যেখানেই নতুন কথার অবতারণা করতে গেছেন, ভ্রান্তি এসে তাকে আচ্ছন্ন করেছে। তিনি স্টাইলকে ভঙ্গি হিসেবে ধরেছেন বলেই গোলযোগ দেখা দিয়েছে। যথা, "ঐ স্টাইলেই শিল্পীর মেজাজ বা মনোভাব বোঝা যায়, কিন্তু চরিত্র বা ক্যারাক্টার ধরা পড়ে তাতে কমই।" বা "ব্যক্তিত্বের মশলা দিয়ে চরিত্র গড়লে প্রতি ঘটনা-সংঘাতে

তা নূতন হয়ে ওঠে।" নতুবা, "স্টাইলের পেছনে ব্যক্তিত্ব বর্তমান, কিন্তু স্টাইলই ব্যক্তিত্ব নয়, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব কখনো ধরা পড়ে না।" অথচ এ প্রবন্ধের শেষের দিকে বলেছেন, "ব্যক্তিত্বের অভাব শিল্পের ক্ষেত্রে কোনো কিছু দিয়েই পূরণ করা যায় না।" এরকম আপাতবিরোধী এমন অনেক কথা রয়েছে। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র যে এক নয়, ব্যক্তিত্বের মশলা দিয়ে চরিত্র যে গঠন করা যায় না—দর্শনের বা মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণাগুলি মনে রাখলে তিনি এমন সব কথা বলতেন না। প্রবন্ধগুলি পড়লে একটা ইমপ্রেশন মনে আসে, সেটা হল বইটির মধ্যে ছাত্রজনোচিত মনোভাব একটু অত্যধিক মাত্রায় উচ্ছ্বসিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এই উচ্ছ্বাসের পেছনে আছে আধুনিক জীবনের মানবধর্মের মুক্তির আনন্দ, কিন্তু সম্পূর্ণ জানার দাবি নেই। ফলে অস্পষ্টতা, বিরোধী মন্তব্য, বিপরীত কথা এসেছে। সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের দর্শন সম্বন্ধে এরকম অর্বাচীন উক্তি না করলেই ভালো হত, কোনো ইংরেজ বললে একে মেনে নিতুম, "প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে ধর্মের ভিত্তিতে আত্মোন্নতির বিভিন্ন মার্গের উল্লেখ আছে, অথচ নেই কোনো আত্ম-সমালোচনার স্পষ্ট কথা মানুষের সুদূর প্রয়াসী দৃষ্টি ও সত্যবর্জিত কর্মদক্ষতার কথা।" (১১ পৃঃ) আশা করি পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো ত্রুটিমুক্ত হবে।

বার্ণিক রায়

পত্রিকা প্রসঙ্গ

Perspective ‖ Rs. Two.

আমাদের দেশে অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা যথেষ্ট না হলেও নিতান্ত সামান্য নয়। কিন্তু সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতির চর্চা সংবলিত পত্রিকার অভাব অত্যন্ত প্রকট। অথচ দেশের উন্নয়নমূলক প্রয়াস ও তজ্জনিত সমস্যাবলীর পটভূমিতে এ জাতীয় পত্রিকা প্রকাশের আবশ্যকতা খুবই জরুরী। এই পরিস্থিতিতে উক্ত অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পার্সপেক্‌টিভ' আমাদের সাধুবাদের যোগ্য। আপাতত এটি প্রবন্ধ সংকলন রূপে প্রকাশিত হবে—কিন্তু নিয়মিত ত্রৈমাসিকে পরিণত করাই উদ্যোক্তাবৃন্দের পরিকল্পনা।

প্রথম সংখ্যায়—জানুয়ারী সংখ্যা—প্রকাশিত মুখবন্ধের থেকে জানা যায়, উদ্যোক্তারা উৎপাদনের উপকরণসমূহের সামাজিক মালিকানা ও জনস্বার্থে অর্থনীতির পরিকল্পনা তথা সমাজবাদে আস্থাশীল। তাঁরা অকপটেই জানিয়েছেন সমসাময়িক ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যাসমূহের সমাজবাদী অনুশীলন ও সমাজের অর্থনৈতিক দেহে দ্বন্দ্বের উদ্ঘাটন পত্রিকা প্রকাশের প্রাথমিক ও মুখ্য অভিপ্রায়। অন্যান্য দেশের অর্থনীতির সমস্যাবলী, বিশেষত অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিচারও পত্রিকাটির লক্ষ্যের অন্তর্ভূত। তদুপরি ইংরেজী ভিন্ন অন্য বিদেশী রচনার অনুবাদ প্রকাশ প্রতি সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে। স্বভাবতই এমন একটি পত্রিকার প্রকাশে কেবলমাত্র অর্থনীতির বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিতরাই নন, অর্থনীতির বিষয়ে আমাদের মতো সাধারণ জিজ্ঞাসুমাত্রই লাভবান হবেন।

আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত নয়টি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য ইউরোপের মধ্যযুগ, বিশেষত সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মার্ক ব্লকের La Societie Feodale বা 'সামন্ত সমাজ' গ্রন্থটির থেকে শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রায় অনূদিত দুটি অধ্যায়।

সামন্ত-ব্যবস্থা ইউরোপের অনন্যতন্ত্র কিনা—এটি প্রাচীন ও বহুল বিতর্কিত বিষয়। অনূদিত অংশটিতে ব্লক এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত

করেছেন, সামন্ততন্ত্রের বিকাশ একমাত্র ইউরোপেই নয়, অন্যত্রও
ব্লকের বিবেচনায় সামন্ত-সমাজের লক্ষণ সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত
কিছু ধারণা, যেমন, সামন্ততন্ত্রকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
seignioral regime বা ভূম্যধিকারীর আধিপত্যের সঙ্গে অভেদ
করা ভ্রান্ত। তাঁর মতে কৃষকসাধারণের কঠোর অর্থনৈতিক
ভূসম্পত্তির পরিমাণের সঙ্গে ক্ষমতার অভিন্ন সম্পর্ক, ঊর্ধ্বতনের প্রতি
আনুগত্য এবং জনসাধারণ ও মুষ্টিমেয় প্রভুবর্গের মধ্যে পালক ও
সম্পর্ক, সমাজে ক্ষমতা ও মর্যাদার স্তরভেদ, সামরিক ও অন্যান্য
প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নিম্নস্থ সামন্তকে fief বা ভূসম্পত্তিদানের ব্যবস্থা,
খণ্ডীকরণ ও পরিণতিস্বরূপ বিশৃঙ্খলা, ভূমিদাস ব্যবস্থা, অর্থের সঙ্কুচিত
জীবন ও সমাজের মন্থর গতি সামন্ত-ব্যবস্থার মৌল লক্ষণ। এবং
ভেদের চিহ্ন বহন করেও সামন্ততন্ত্রের এই মূল বৈশিষ্ট্য সমূহের নিদর্শন
জাপান, মিশর বা অন্য অনেক দেশের ইতিহাসে বর্তমান। ইউরোপে
ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই সামন্ত-সমাজের পরিবর্তনের শুরু।
এই ব্যবস্থার অবশেষের দীর্ঘকাল ব্যেপে টিকে থাকা ও পুনরুজ্জীবন
ব্লকের আলোচনাটি আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে
প্রাসঙ্গিক।

মরিস ডবের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ—An essay on Economic
Growth and Planning—সম্পর্কে শ্রীঅজিত বিশ্বাসের প্রবন্ধ জটিল
স্বচ্ছ ও চিন্তাউদ্দীপক আলোচনার দৃষ্টান্ত। অর্থনৈতিক
আগ্রহান্বিত অর্ধোন্নত দেশসমূহে উৎপাদন পদ্ধতি—শ্রম-প্রগাঢ় অথবা
প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি—নির্বাচনের সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
তুলনায় অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশে শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি অবলম্বনের
বক্তব্য ব্যাপক প্রচারিত। কিন্তু এই চিন্তাধারা যে অর্থনীতির যুক্তি-বিচারে
গ্রাহ্য নয়, বরং বিপরীতটাই সাধারণত সত্য অর্থাৎ ত্বরান্বিত উন্নয়ন
প্রগাঢ় পদ্ধতির অপেক্ষা রাখে—ডবের এই সিদ্ধান্ত ও এ সম্পর্কে আলোচনা
মূলগত সারবত্তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

তথাপি, শ্রীঅজিত বিশ্বাসের বিচারে, ডবের বিশ্লেষণ যথেষ্ট
প্রথমত, ডবের বিশ্লেষণ অনুযায়ী পরিকল্পিত অর্থনীতির সাফল্যের
অর্থনীতির সাংগঠনিক ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর সাবিক রূপান্তর

এবং অর্ধোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনাতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ বর্তমান। অথচ তাঁর সমগ্র আলোচনাটি এই দেশগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো ও উৎপাদন সম্পর্ক নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতির প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত হলেও স্বল্পকালে সর্বোচ্চ উৎপাদন ও কর্ম-সংস্থানের বিবেচনায় শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিকল্পনার সমস্যা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা প্রধানত বিবরণমূলক এবং মূল্যায়নে অসম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে শ্রীবিশ্বাসের অভিমতে এই গ্রন্থে ডবের কৃতিত্ব কোনো নতুন জিজ্ঞাসার উত্থাপনে নয়, রিকার্ডো প্রমুখ ক্লপদী ধনবিজ্ঞানীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশ সম্পর্কে প্রাচীন জিজ্ঞাসার নবায়নেই ডবের নতুন গ্রন্থের সার্থকতা।

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার পটভূমিতে আলোচ্য সংকলনের সম্ভবত সর্বাধিক উল্লেখনীয় সন্দর্ভ কে. ম্যাথু কুরিয়ানের 'বেসরকারী বিদেশী মূলধন ও পরিকল্পনা'। এই তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে লেখক ভারতে ব্যক্তিগত বিদেশী মূলধনের ভূমিকার বিষয়ে প্রচলিত ধারণা ও তৎসংক্রান্ত সরকারী নীতি খণ্ডনে কৃতকার্য।

শ্রীকুরিয়ানের বিশ্লেষণ অনুসারে, প্রথমত, ১৯৪৮-৫৮—এই দশ বৎসরে ভারতে লগ্নীকৃত ব্যক্তিগত বিদেশী মূলধনবৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু দুটি পরিকল্পনাকালে সংগৃহীত সরকারী বিদেশী মূলধন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের তুলনায় গড়পড়তা বার্ষিক ১৬·৬ কোটি টাকার বেসরকারী বিদেশী মূলধনের লগ্নীর গুরুত্ব যৎসামান্য।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ ভারতের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সহায়ক—এই বক্তব্যের কোনো তথ্যগত সমর্থন নেই। কেননা নতুন নিয়োজিত বেসরকারী বিদেশী মূলধনে প্রকৃতই বিদেশ থেকে আমদানীকৃত অংশ অকিঞ্চিৎকর—এর প্রধান অংশটি এদেশে লগ্নীকৃত মূলধনের বিপুল মুনাফার একাংশের পুনর্বিনিয়োগ। অধিকন্তু বার্ষিক ১৬·৬ কোটি টাকার ব্যক্তিগত বিদেশী মূলধন লগ্নীর তুলনায় বিদেশী কোম্পানির রপ্তানিকৃত মুনাফা ও লভ্যাংশের বার্ষিক গড়পড়তা পরিমাণ ২৬·১ কোটি টাকা। এর অর্থ ভারতে বিনিয়োগযোগ্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের অংশবিশেষের বিদেশে উদ্বেগজনক হস্তান্তর। বস্তুত এ বিষয়ে সকল তথ্যগত উপাদানের সামগ্রিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের ব্যালান্স ও

বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারের উপর বেসরকারী বিদেশী মূলধনের প্রভাব অনুকূল নয়, বরং রীতিমতো প্রতিকূল এবং তার হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা অন্তত ১১ কোটি থেকে ৩৪ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তৃতীয়ত, উপরোক্ত তথ্য ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সহযোগিতার পটভূমিতে ব্যক্তিগত বিদেশী মূলধনকে উৎসাহ দানের সরকারী নীতিও অবিবেচনাপ্রসূত। বিদেশী কোম্পানির মুনাফা রপ্তানির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, বিতরিত লভ্যাংশের করের হার বৃদ্ধি, ঐ সব প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থাগ্রহণ উন্নয়ন-মূলক অর্থনীতির প্রয়োজন ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা প্রসঙ্গে ডাঃ পি. সি. জোশীর 'ভারতে কৃষি সংস্কার' সম্পর্কে নিবন্ধটিও বিশেষ মূল্যবান। আলোচ্য সংখ্যায় এই আলোচনার প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়েছে। এই অংশে লেখক ভারতে ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমি বন্দোবস্তের প্রকৃতি ও বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, বিদেশী শাসনে অর্থের ব্যাপক প্রচলন ও গণ্য অর্থনীতির প্রসার এক আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে জিইয়ে রাখার সহায়ক হয়েছে। এই ব্যবস্থার দৌলতেই "কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত খাজনাভোগী-ব্যবসায়ী-মহাজন গোষ্ঠী কর্তৃক কবলিত। আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ ও মহাজনী কারবারে এই অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের অপব্যবহারের ফলে কৃষিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত এবং পরিণতিতে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে কৃষির প্রগতিশীল বিকাশ সর্বদা ব্যাহত।"

এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রাক্-স্বাধীনতা কালে কৃষিসংক্রান্ত কর্মসূচী প্রণয়নে দুটি সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র ধারা বর্তমান ছিল। এক দিকে, ইংরেজ সরকার, সরকারী বিশেষজ্ঞ ও কমিশনসমূহের লক্ষ্য ছিল প্রচলিত কৃষি-সম্পর্ককে অটুট রেখে শুধু উৎপাদন-পদ্ধতির টেকনিক্যাল উন্নতি ঘটিয়ে কৃষিসমস্যার সমাধান। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ। কৃষিতে অচলাবস্থা অবসানের অপরিহার্য পূর্বশর্ত প্রচলিত ভূমি-বন্দোবস্তের আমূল পরিবর্তন ও জমিদারী-মহাজনী শোষণের উচ্ছেদ—রমেশচন্দ্র দত্তের রচনা থেকে শুরু করে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাব, ফৈজপুর কংগ্রেসের কৃষিসম্পর্কিত প্রস্তাব বা জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদের সুপারিশ ইত্যাদি সব কিছুতেই

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমবিবর্তন ও বিকাশ লক্ষণীয়। বলা যেতে পারে, সমগ্র জাতীয় আন্দোলন কৃষিব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর এবং শোষণমুক্ত স্বাধীন কৃষক অর্থনীতির বিকাশের জন্য মূলত অঙ্গীকৃত ছিল। এবং এই পটভূমিতেই স্বাধীনতা উত্তর কালে কৃষিনীতির পর্যালোচনা পরবর্তী সংখ্যার আলোচ্য বিষয়।

'জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি'র সম্পর্ক বিবেচনা করে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডাঃ জ্ঞানচাঁদ প্রতিপাদন করেছেন, অর্ধোন্নত দেশ সমূহের বুভুক্ষা, মহামারী, দারিদ্র্য ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে উপায় হিসেবে নির্দেশ করার রেওয়াজটি কেন্দ্রীয় সমস্যাবিচ্যুত। কারণ এসব দেশের সমস্যা সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও সম্পত্তির সম্পর্কের সঙ্গে মূলগতভাবে যুক্ত। ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি অর্জন উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন সাপেক্ষ।

অন্যান্য প্রবন্ধসমূহের মধ্যে পরিকল্পিত অর্থনীতির স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় বিনিয়োগ রোধের উদ্দেশ্যে কাঁচামাল ও শ্রমিক এবং ক্ষয়ক্ষতিপূরণ ও আধুনিকীকরণ বাবদ ব্যয়ের উপর ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা এবং এই প্রসঙ্গে নীট বিনিয়োগ ও নীট জাতীয় উৎপাদনের পরিবর্তে মোট (gross) বিনিয়োগ ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ধারণা দুটি ব্যবহারের আবশ্যকতা প্রসঙ্গে শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্যের আলোচনা এবং শ্রী পি, কে, শর্মার তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কে কার্যকরী সমালোচনা উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে আমরা এই সঙ্কলনের সমাদর ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং পুনরায় উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

রণজিৎ দাশগুপ্ত

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ পত্রিকা ১৯৬১ ॥ সম্পাদক : সুবিমল কাহালী ॥

ছাত্রজীবনে স্কুল কলেজ পত্রিকাগুলির মূল্য অনেক। যে বয়সে নিজের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না, যে কোনো চিন্তা বা ভাবকে রূপায়িত করতে পারলেই অনন্য মনে হয়, মনে হয় আবিষ্কার, সেই বয়সে আত্মপ্রকাশ করার বাসনাও তীব্র। এই আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার অন্তরালে থাকে অহংবোধ, থাকে আপন শক্তির প্রতি সহজ বিশ্বাস। শুধু একা নয়, দশজন ছাত্রবন্ধুর কাছে, অধ্যাপকদের কাছে নিজের সৃষ্টি পৌঁছে দেওয়ার

জন্য যে বাসনা, তা যেকোনো শিল্পীর চরিত্রগত অহংকার। বিদ্যায়তনের মুখপত্রগুলি সেই পৌঁছে দেওয়ার বাহন, আর তাই তো এগুলিকে ঘিরে কত উৎসাহ, কত আনন্দ। একথাও সত্য, অনেক প্রতিষ্ঠিত স্রষ্টারও প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে এই ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলির মাধ্যমে।

প্রতি বছরেই ছাত্র ও অধ্যাপকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সততাকে নির্ভর করে কলেজ-পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়। অধ্যাপকদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ ছাড়া ছাত্রদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতি রচনা নিয়ে এ পত্রিকাগুলি আত্মপ্রকাশ করে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ১৯৬১ সালের পত্রিকাটি উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতা দিয়ে পত্রিকাটির শুরু। সাম্প্রতিক কবিতার বিষয়বস্তু ও প্রকরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে ছাত্ররা যে সম্পূর্ণ সজাগ তা এই কবিতাগুলি পড়লে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি পুরনো ঢং-এর কবিতাও স্থান পেয়েছে। পান্নালাল দাশগুপ্তের 'প্রতিবিম্ব' অপেক্ষাকৃত পরিণত কবিতা। দীপককুমার চক্রবর্তীর 'জীবনানন্দ স্মরণে' রচনাটি পড়ে মনে হল কবি জীবনানন্দকে ভালোবাসেন। শব্দচয়নে, চিন্তার পদচারণায় তিনি নিজের শক্তির চাইতে প্রিয় কবির উপরই বেশি নির্ভর করেছেন।

পত্রিকাটিতে গল্পাংশ দুর্বল হলেও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। প্রায় প্রবন্ধেরই তথ্য পরিবেশন ও রচনারীতি বলিষ্ঠ। বিশেষ করে প্রশান্তকুমার রক্ষিতের 'ছোটগল্পের অভিধান' ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে ভালো রচনা। অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ক্ষীরোদপ্রসাদ ও নরনারায়ণ' ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে লেখা। হারাধন মণ্ডলের 'কবি পাস্তেরনাক ও সাঁ-ঝাঁ পার্স' একটি সুন্দর প্রবন্ধ। তরুণ ভট্টাচার্যের 'জীবনানন্দের কবিমানস'-এ জীবনানন্দকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। আশীষ দে-এর 'মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে রসায়ন শাস্ত্র' সুলিখিত যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ। রম্যরচনা দুটির মধ্যে অধ্যাপক রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বায়ন' রচনাটিই অপেক্ষাকৃত ভালো। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রবন্ধাবলীতে রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। ঐ প্রবন্ধগুলিই আলোচ্য সংকলনটির পক্ষে মর্যাদাস্বরূপ।

ইংরাজী বিভাগে অধ্যক্ষ রমণীমোহন রায়ের 'Stray Reminiscences & Random Reflections on Education' সময়োপযোগী আলোচনা। অধ্যাপক সুভাষ সরকারের Eliot and the Existential Idea, সহ-অধ্যক্ষের The Great Odes of Keats, ডক্টর অনিলকুমার ভট্টাচার্যের An outline of the Cancer Problem, ভাস্করদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের English Satires উল্লেখযোগ্য ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ।

পত্রিকাটির প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও ছাপা মনোরম।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

পাঠকগোষ্ঠী

প্রতিবাদপত্র

পৌষ সংখ্যার "পরিচয়ে" আধুনিক সাহিত্যিকদের দায়িত্বহীনতায় শ্রীঅশোক রুদ্রের "বিরক্তি, উষ্মা ও দুশ্চিন্তা"র অভিব্যক্তিতে একই সঙ্গে বিস্ময় ও কৌতুক বোধ করেছি। অবশ্য একথা আমি মনে করি যে আজকাল যাঁরা লিখছেন তাঁরা সকলেই কিছু একটা সাহিত্যিকের দায়িত্ব পালন করছেন না, বরং অনেক ক্ষেত্রে উল্টোটাই সত্যি ; কিন্তু বিস্মিত হয়েছি এই দেখে যে আমার বিবেচনায় যাঁরা সাহিত্যিকের দায়িত্ব পালন করছেন তাঁদেরই কয়েকজন অশোকবাবুর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য। আর কৌতুক বোধ করেছি এইজন্যে যে অশোকবাবু অপরের ঘাড়ে দায়িত্বহীনতার অভিযোগ চাপাবার উল্লাসে আপন দায়িত্ব বিস্মৃত হয়েছেন অর্থাৎ লেখাগুলির তাৎপর্য প্রতিক্রিয়াশীল কিনা তা বিচারের আগে আলোচ্য লেখাগুলি মন দিয়ে পড়বার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। দায়িত্ব কি কেবল একা লেখকের? পাঠকের নয়? বিশেষ করে পাঠক যখন সমালোচকের ভূমিকাতে অবতীর্ণ?

তা সত্ত্বেও অশোকবাবু আলোচনার শুরুতে বর্তমান বাংলা সমাজ সম্বন্ধে যে-সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তার কোনো কোনো অংশের জন্যে সাধুবাদ তাঁর অবশ্যপ্রাপ্য এবং এ-অংশ সম্বন্ধে আমার আক্ষেপ শুধু এই যে বর্তমান সমাজের কিম্ভূত রূপ বর্ণনায় তিনি আরও তীব্র হলেন না কেন! একথাও আমার মনে হয়েছে, যে-সমাজ ভণ্ডামির উপরেই দাঁড়িয়ে, তার সম্বন্ধে অশোকবাবু যথেষ্ট অসহিষ্ণু নন। যদি তিনি যথেষ্ট অসহিষ্ণু ও বিক্ষুব্ধ হতেন তাহলে হয়তো একথা বুঝতেন যে যাঁদের লেখনীকে তিনি প্রগতি-বিরোধী বলে ধিকৃত করেছেন তাঁদের সঙ্গেই তাঁর সহমর্মিতা। কিন্তু মনে হয় যে অশোকবাবু বর্তমান সমাজের সমস্যাকে ভালো করে তলিয়ে দেখেন নি, তাই, আশা করছেন যে এই উচ্ছন্নে-যাওয়া দেশবাসীর কানে মার্কসের মন্ত্র একবার জপে দিতে পারলেই হতভাগ্যেরা উদ্ধার পেয়ে যাবে এবং সাহিত্যিকেরা যেহেতু কানে মন্ত্র জপে দিতে বিমুখ সেজন্যে তাঁরা দায়িত্বহীন।

অশোকবাবু অনেক কিছুই বলেছেন ও ভেবেছেন কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে একটি প্রশ্ন তাঁর মাথায় আদৌ আসে নি। প্রশ্নটি হল এই যে, আজকের কয়েকজন লেখক কোন্ অবস্থার চাপে এবং কিসের লোভে বা উদ্দেশ্যে অশোকবাবুর পক্ষে বিরক্তিজনক ধরনের গল্প লিখতে শুরু করেছেন। অশোকবাবুর আলোচনাটিতে এ-মতের সপক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে যে যাকে বলা হয়েছে নতুন ধরনের গল্প সে সবের পাঠকসংখ্যা বেশি নয়। যখন পাঠকেরা ফিরিয়ে দেন লেখককে তখনই তিনি অভিমানে বলেন, তাঁর দরকার নেই বেশি পাঠকে। অথচ পাঠক তো চাইই লেখকের। এমন কোনো লেখকের কথা কি কখনও কেউ শুনেছেন, যিনি তাঁর নির্দিষ্ট পাঠকসংখ্যার জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক বইয়ের বেশি বই ছাপতে দেন নি। তাছাড়া লেখকের প্রয়োজনীয় অর্থ লেখা থেকেই আসবে এটাই তো কাম্য ব্যবস্থা। যখন কোনো লেখক বলেন প্রচুর পাঠক না হলেও তাঁর চলবে তার নিহিতার্থ এই যে, আমোদ দিয়ে যে-রচনা প্রচুর পাঠককে আকর্ষণ করে সে-রচনায় হাত দিতে তিনি গররাজি। অর্থাৎ তিনি চরিত্রভ্রষ্ট হবেন না, নিজের কাছে সৎ থাকবেন। অর্থাৎ অশোকবাবু মূল্যবোধহীন যে-সমাজের চিত্র তাঁর আলোচনার শুরুতে দিয়েছেন সে-সমাজের অনুগত হবেন না। এখন মুশকিলটা হয়েছে এই যে অশোকবাবুর অভিধানে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যতীত সাহিত্যবিচারের শব্দ নেই, কিন্তু সাহিত্যিকদের সম্বল তাঁদের হৃদয় ও চরিত্র। তাঁরা ভাবেন যে দৈনন্দিনকার জীবনযাত্রায় মানুষ নিজেকে ভুলে থাকে, তার সেই আত্মবিস্মৃতি ভাঙিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের কাজ এবং সে-কাজ যে-লেখা করে না তা আমোদের লেখা হতে পারে, সাহিত্য নয়।

সত্যবাবু ও প্রদ্যোৎবাবুর লেখা "পরিচয়ে" এবং দীপেনবাবুর লেখা "পরিচয়" ও "নতুনসাহিত্যে"ই মাত্র দেখেছি ; তাই আমার অনুমান এঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী। আমি নিজে অবশ্য সর্বক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য পোষণ করি না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ অশোকবাবু নিজেই বলেছেন যে "ভালো সাহিত্য কি, সাহিত্যে প্রগতি কি, সাহিত্যে বাস্তবতা কিভাবে অনুশীলন করা উচিত এসব প্রশ্নের এক কথায় উত্তর নেই।" অন্যত্র তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির দুটি মূলনীতি নির্দেশ করেছেন এইভাবে : "এক হচ্ছে মানুষকে বাস্তব জগতের

কেন্দ্র হিসেবে দেখা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে মানুষকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা।" মার্কসের 'ম'-টুকু আমি জানি বা না-জানি, কিন্তু একথা হলফ করে বলতে পারি যে এদুটো নীতিই অন্তত চারশো বছরের পুরনো এবং অনেক পাঁড় মার্কসবিরোধী ব্যক্তিও উভয় নীতিতেই বিশ্বাসী। আমি নিজেও। কিন্তু সমালোচনায় এ-দুটি নীতির প্রয়োগ কীভাবে হওয়া উচিত? এক কথায় এ প্রশ্নেরও জবাব নেই, সেটা অশোকবাবু বুঝতে চান নি। তার ফল হয়েছে মারাত্মক।

ধরা যাক সত্য গুপ্তের গল্প "ঘোলা জল নোনা জল" গল্পটির কথা। আমার বিবেচনায় সত্যবাবু এ-গল্পে তাঁর বক্তব্যকে যথাযথ তথা পরিপূর্ণ সাহিত্যসম্মত রূপ দিতে পারেন নি, তাই গল্পটি সার্থক নয়। ত্রুটিটা এখানে রূপগত, সেজন্যে আমাদের হাতে যে-গল্পটি এসে পড়েছে সেটিকে মনে হচ্ছে যেন এক গ্লানির নির্বস্তুক নির্যাস। কিন্তু আপাতচোখে যা মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কি প্রকৃতই তা-ই? একটি বিশেষ দেশের একটি বিশেষ কালের গ্লানিপূর্ণ পরিস্থিতির পটে একটি মানুষের বেঁচে থাকার স্বরূপকেই কি লেখক রূপ দিতে চান নি? হয়তো একথাও সত্যবাবু বলতে চেয়েছেন তাঁর পাঠকদের, দেখ, এই হল সম্প্রতি স্বদেশে বেকারদের বেঁচে থাকার চেহারা, এই চেহারাটা অনুভব কর, এর যন্ত্রণাটা অনুভব কর, তারপরে প্রতিকারের পথ খোঁজ। একথা অশোকবাবুও বলবেন নিশ্চয়ই যে এ-গল্প আমোদ দেবার জন্যে লেখা হয় নি, এ-গল্প আমাদের এমন কোনো কল্পলোকে নিয়ে যায় না যেখানে আমরা স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার স্বরূপকে বা জীবনকে ভুলে যেতে পারি, বরং পাঠককে আঘাত করতে চেয়েছেন যাতে পাঠক আত্মবিস্মৃতি থেকে জেগে ওঠে। তিনি তা পারেন নি, সেটা তাঁর দুর্বলতা, কিন্তু তাই বলে তাঁর সাধু উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করব কেন? কেন বলব যে এ-দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিবিরোধী?

অশোকবাবু বলেছেন : "প্রদ্যোৎবাবু ও সত্যবাবুও বলেছেন, আর সব-কিছু ভুলে যাও, শুধু অপরাধবোধটাকে দেখ, শুধু গ্লানিটাকে দেখ।" তবে কি প্রদ্যোৎবাবু ও সত্যবাবু এডমণ্ড হুসের্ল কথিত "phenomenological reduction"-ই করেছেন? মনে হয় নাম ও পারিভাষিক শব্দ বর্জন করে মার্ক-সমালোচক অশোকবাবুর ইঙ্গিতটা সেদিকেই। কিন্তু প্রদ্যোৎবাবু ও সত্যবাবু সত্যই কি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে অর্থাৎ বহির্জগৎ থেকে

হুসের্ল-কথিত "bracketing" করে শুধু অপরাধ-বোধ ও গ্লানিবোধকে দেখাতে চেয়েছেন? গল্পদুটির ভিতরে আন্তরিকভাবে প্রবেশ করলে যে-কেউ দেখতে পাবেন যে দেশ-কাল-পাত্র-শূন্য একটা কোনোও বোধকে তাঁরা রূপ দিতে চান নি, চেয়েছেন সেই সমাজের স্বরূপ ফোটাতে যে-সমাজের বিষাক্ত চক্রে অপরাধ-বোধ বা গ্লানি-বোধ নিরন্তর জন্ম নিচ্ছে এবং এ-চক্রের মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগতভাবে অসহায় অস্তিত্বের চেহারা অর্থাৎ এ-সমাজে যতক্ষণ মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক ব্যক্তি হিসেবে আছে ততক্ষণ সে অসহায়। লেখকদের এই উদ্দেশ্যের মধ্যে অমানবিকতা কোনখানে? যা বিচার্য হতে পারত তা হল লেখকেরা তাঁদের উদ্দেশ্যে কতখানি সফল হয়েছেন। অশোকবাবু তা না করে ছায়ার সঙ্গে লড়াই করেছেন। তাতে তাঁর গায়ে ব্যথা হয়েছে কিনা সে-কথা অবশ্য তিনিই বলতে পারবেন।

প্রকৃতপক্ষে অশোকবাবু বিরক্তি, উষ্মা ও দুশ্চিন্তাতে এতই উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হয় যে তিনি লেখাগুলি ভালো করে পড়েই দেখতে পারেন নি। তিনি বলেছেন যে সত্যবাবুর নায়ক অচিন্ত্যের সম্প্রতি মা মারা গেছে এবং সুমিতা নাম্নী কোনোও মেয়েকে বাস্তবে বা স্বপ্নে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে তার হাত থেকে একটি পাঁচ টাকার নোট উড়ে যায়। হায়, তত্ত্বালোচনাকারীকেও মধ্যে মধ্যে কল্পনার দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। নতুবা সত্যবাবুর গল্পের নায়কের মা সম্প্রতি মারা গেল কেন, সুমিতাকেই বা সে জড়িয়ে ধরতে গেল কেন? গল্পে তো কোথাও বলা হয় নি যে তার মা সম্প্রতি মারা গেছে, বরং ইঙ্গিত আছে অনেকদিন আগে মারা যাবারই, আর সুমিতাকে সে কখনওই জড়িয়ে ধরতে যায় নি। এইভাবে উপর-উপর পড়ে সমালোচনা করাটাই কি মার্কসবাদী দায়িত্ববোধের পরাকাষ্ঠা?

কথা হচ্ছে কেউ যদি জেগে জেগে ঘুমোন তবে তাঁর ঘুম কী করে ভাঙানো যায়? দীপেনবাবুর "ফুল ফোটার গল্পে"র একটি বাক্য অশোকবাবু উদ্ধার করেছেন অবোধ্যতার নমুনা হিসেবে: "দেশটা তখন 'নৌকো' হয়ে মোহানায় যাবার উৎসবে মেতেছে।" এই বাক্যটির পেছনে যে-বিশেষ অর্থ আছে তা বাদ দিলেও একটা দেশ একটা বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের দিকে যাবে বলে মেতে উঠেছে এই আপাত অর্থটাও কি দুর্বোধ

কষ্টকল্পনা? সাহিত্যপাঠ সময়ের অপচয় মনে করেন যাঁরা আমি তাঁদেরই একজনকে অনুরোধ করেছিলাম গল্পটি পড়তে। গল্পটা তিনি সবখানি পড়েন নি। আমি তাঁকে জিগেস করলাম, আচ্ছা, নদীর ওপারের দেশ কোনটা বুঝতে পেরেছেন? তিনি জবাব দিলেন, মনে হলো তো পাকিস্তান। এটুকু আমি বলে নিলাম এজন্যে, গল্পে বর্ণিত দুটি দেশ যে পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-বঙ্গ একথা গল্পটি পড়লে রাম-শ্যামও বুঝতে পারবেন তার স্বপক্ষে নজীর হিসেবে। কিন্তু অশোকবাবু যদি বুঝব না বলে পণ করেন তাহলে তাঁকে বোঝাবে কে? পূর্ব-পাকিস্তানে নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল 'নৌকো'। Wild Duck নাটকের কী প্রতীক আছে বা নেই সে-তথ্যও যাঁর নখ-দর্পণে, ইতিহাস ও ইতিহাসের ধারায় প্রগতির অস্তিত্ব যিনি আবিষ্কার করেন, surrealism, existentialism, expressionism-কেও সহজেই যিনি চেনেন সেই অশোকবাবুই যখন দীপেনবাবুর একটি বাক্যে এসে অথই পাথারে পড়েন তখন কৌতুকই বোধ হয় নাকি?

দীপেনবাবুর ক্ষেত্রে অশোকবাবুর অভিযোগ একই সঙ্গে কৌতুকাবহ এবং মর্মান্তিক। তিনি বলেছেন যে "ফুল ফোটার গল্পে" নাকি কোনোও বিষয়ই খুঁজে পান নি। অথচ সংক্ষেপে গল্পটি বলতে গিয়ে অশোকবাবু দিব্যি গল্পটা বলে দিয়েছেন। এর পরেও অশোকবাবু যখন বলেন যে তিনি গল্পটা মোটেই বোঝেন নি, তাঁর কাছে গল্পটা একটা ধাঁধাই থেকে গেছে তখন ভাবি যে তিনি আসলে কী চান গল্পে? অবশ্য গল্পটিতে অনেক কিছুই যে আভাসে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, কিছু কিছু জিনিস উহ্য রাখা হয়েছে সেকথা ঠিক। কিন্তু তার কারণ কি এই নয় যে তিনি পাঠকদের আশুচেতনা ও কল্পনাশক্তিতে বিশ্বাসী? পাঠক নিজেও যাতে আপন চেতনা ও কল্পনাকে মুক্তি দিতে পারে তার জন্যেই তিনি প্রচুর অবকাশ রেখে গেছেন। এই সুযোগ দেবার জন্যে পাঠক হিসেবে আমি তো কৃতজ্ঞতা বোধ করেছি দীপেনবাবুর কাছে। বছর কয়েক আগে দীপেনবাবুরই লেখা পূর্ব-পাকিস্তান ভ্রমণের কাহিনী কোনোও বামপন্থী কাগজে পড়েছিলাম—তাতে গল্পে বর্ণিত একজন বীর রমণীর কথাও ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে লেখাটির শিরোনাম ছিল "রিপোর্টাজ"। তার যে-বস্তু ছিল তা এই গল্পের খানিকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। কিন্তু একই

বস্তু নিয়ে সেটি ছিল রপোর্টাজ আর এটি গল্প। দীপেনবাবু যে দেশ-কাল ও পাত্র-পাত্রীর নাম বলে দেন নি এতে আমি তো তাঁর শিল্পবুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি। নিছক সহজীকরণই মার্কসবাদসম্মত সাহিত্য কিনা জানি নে, কিন্তু আমার বিশ্বাস হল এই যে সহজীকরণে অনেক সময় সাহিত্যই বাদ পড়ে যায়, তাতে মার্কসবাদ থাকল কি থাকল না সেটা আলাদা কথা।

বোধ হয় অশোকবাবুও সহজীকরণকে সাহিত্য বলবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক সাহিত্যের বিচারে তাঁকে ভীষণভাবে কেন বিভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে আমার? তা কি এজন্যে যে তিনি আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্ব হতেই কটি ধারণা গড়ে নিয়ে তা প্রমাণে অনর্থক বাক্যব্যয় করেছেন? কোনোও লেখকেরই সব গল্প সমান ওৎরায় না। আলোচ্য পাঁচটি গল্পের মধ্যে একমাত্র দীপেনবাবুর লেখাটিই সাহিত্যসম্মত, কিন্তু বাকি চারটিকে স্বয়ং তাদের লেখকেরাই নিজেদের প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প বলে ভাবেন কিনা সে-বিষয়ে আমি ঘোর সন্দিগ্ধ। পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনাবলী হতেও প্রচুর দুর্বল রচনা উদ্ধার করা যায়, কিন্তু অশোকবাবুও হয়তো মানবেন যে সেটা ছিদ্রান্বেষীরই কাজ। যে কথা আমি চিঠির শুরুতে তুলেছিলাম সে কথায় ফিরে আসি। অশোকবাবু যদি কেবলই দরকারমতো নিজের বিরক্তি, উষ্মা ও দুশ্চিন্তার স্বপক্ষে উদাহরণ খোঁজার তাড়নাতে না-থাকতেন তা হলে হয়তো স্থিরমস্তিষ্কে তলিয়ে ভাবতেন যে একসঙ্গে কজন লেখক কেন স্বেচ্ছায় পাঠকদের আমোদ দেবার দায় থেকে নিষ্কৃতি নিলেন! বাংলা ছোটগল্পে নতুন রীতির আন্দোলন গুজবে থাকলেও বাস্তবে নেই। তবুও কেউ কেউ যে বাঁধা পথ থেকে ছিট্‌কে পড়তে চাইছেন এতে চমকে উঠবে কারা? চমকে উঠবে তারাই কায়েমী স্বার্থের যারা পরিপোষক। যা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত তার সম্বন্ধে তীব্র অসন্তোষ ও বিরূপতাই নতুন লেখকদের নতুন পথ খোঁজার প্রেরণা দিয়েছে। হয়তো "পরিচয়ে"র লেখকগোষ্ঠীর পক্ষে নতুন পথ মানে নতুন বিশ্বাস নয়, তাঁদের কাছে নতুন পথ মানে নতুন রূপকল্প। কায়েমী স্বার্থের পরিপন্থী এসব লেখকদের কাছে আমার অনুরোধ: "Live dangerously. Erect your cities beside Vesuvius. Send out your ships to unexplored seas."

নমস্কার। ইতি। সুরজিৎ দাশগুপ্ত

সংস্কৃতি-সংবাদ

ভারতে বিশ্বশান্তি সংসদ

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে বিশ্বশান্তি সংসদের অধিবেশন হয়ে গেল। সমগ্র পৃথিবীর শান্তিকামী জনসাধারণের ও শান্তিনেতাদের কাছে ভারত শান্তির এক তীর্থস্থান। গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, মহাত্মা গান্ধী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিসাধনার পুণ্যভূমি ভারততীর্থে আগমন তাই বিশ্বের শান্তিনেতাদের পক্ষে মহা আনন্দের বিষয়। অসংখ্যবার অসংখ্য রকমে পৃথিবীর শান্তিনেতারা ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ও অটুট বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন। তাই বিশ্বশান্তি সংসদকে যখন ভারতে আমন্ত্রণ করা হল তখন সংসদের নেতারা এই মনে করেই ভারতে এলেন যে তাঁরা চলেছেন বন্ধুসমাগমে, তাঁরা চলেছেন এমন একটি দেশে যা পৃথিবীর শান্তি অঞ্চলের মধ্যভূমিতে একটি বিস্তীর্ণ সন্ধিস্থল অধিকার করে আছে। এইজন্যই বিশ্বশান্তি সংসদের দিল্লী অধিবেশন সংসদের নেতাদের পক্ষেও যেমন গর্বের ও আনন্দের বিষয়, ভারতে আমাদের সকলের পক্ষেও তা সমানই গর্বের ও আনন্দের বিষয়। সত্য বটে যে, ভারতের বড় বড় সংবাদ-পত্রের কোটিপতি মনিবেরা খাঁটি মার্কিনী কায়দায় এই বলে চেঁচামেচি কিছু কম করেননি যে, বিশ্বশান্তি সংসদের দিল্লী অধিবেশন ভারতের বিরুদ্ধে একটা কমিউনিস্ট চক্রান্ত। কিন্তু তাঁদের অতি ক্ষুদ্র মার্কিনী ভারতের বাইরে যে বিশাল ভারতীয় ভারত আছে, তার হৃদয় বিশ্বশান্তি সংসদের নেতারা অবশ্যই জয় করেছেন।

বড় বড় সাম্রাজ্যের চূড়া আজ ধুলায় লুটোচ্ছে কিন্তু ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতাপের দর্প ক্রমাগত যেন বেড়েই চলেছে, ইতিহাসের এই একটা মূঢ় পরিহাসের সামনে আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি। তাই জাতীয় স্বাধীনতার জন্য জাগতিক সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে আজ আমরা পর্তুগাল, বেলজিয়াম ও দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকসম্প্রদায়কেই বিপক্ষ দলের রথী রূপে আরূঢ় দেখতে পাচ্ছি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেলেন শল্য হলেন রথী! কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ,

কর্ণ ঠিক গত হননি, এই কথাটা বোঝানোর জন্যই হয়ত শল্যদের পক্ষে লড়াইটাই হয়ে উঠেছে শেষ অঙ্কের চূড়ান্ত লড়াই। এইজন্যই দেখতে পাচ্ছি যে, বীরশ্রেষ্ঠ পাত্রিস লুমুম্বার সৈনাপত্যে পরিচালিত কঙ্গোলি জনবাহিনীর সম্মুখে পলাতক বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সিংহচর্মাবৃত গর্দভের মতো করুণ দৃশ্যের অবতারণা করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটল কঙ্গোতে শান্তির শ্বেত পতাকা হস্তে জাতিসংঘের সেনাবাহিনীর আবির্ভাব। একদিন জাতিসংঘের সেনাবাহিনী কোরিয়ায় শান্তির নামেই শান্তিকে হত্যা করার রক্তাক্ত চক্রান্তে অবতীর্ণ হয়েছিল। কঙ্গোতে তাঁরা পণ করে বসলেন কিছুতেই তাঁরা নিজেরা রক্তপাত করবেন না। সুতরাং তাঁরা অত্যন্ত 'অহিংস' ভাবে কঙ্গোর বিমানঘাঁটি, বন্দর, বেতার কেন্দ্র, যাতায়াত পথ প্রভৃতি অধিকার ও অবরোধ করে লুমুম্বা সরকারের উচ্ছেদ সাধিত করলেন; 'অহিংস' ভাবে বন্দী লুমুম্বার গৃহদ্বারে 'পাহারা' বসিয়ে রাখলেন; উপনিষদুক্ত সাক্ষী দ্রষ্টার মতো তাঁরা রাগদ্বেষহীন চিত্তে দর্শন করতে লাগলেন যে, কঙ্গো ত্যাগ করার পরিবর্তে বেলজিয়ান সৈনিকেরা ও বেলজিয়ান বিশেষজ্ঞেরা পঙ্গপালের মতো কঙ্গো ছেয়ে ফেলছে, সঙ্গে সঙ্গে কঙ্গোয় মানুষ শিকারের জন্য আসছে ভাগ্যান্বেষী ও অর্থগৃধ্নু ফরাসী ভলান্টিয়ার, ইংরেজ ভলান্টিয়ার, মার্কিন ভলান্টিয়ার, দক্ষিণ আফ্রিকান ভলান্টিয়ার প্রভৃতির ব্যাটেলিয়ানের পর ব্যাটেলিয়ান এবং এই সব বিদেশী দস্যুদের নায়কত্বে গঠিত শোম্বে, মোবুতু ও কালোনজির দেশী ঠগী বাহিনীরা কঙ্গোলি জাতির জীবন্ত দেহকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে নিজেদের রক্তপিপাসাকে চরিতার্থ করছে; তারপর জাতিসংঘ বাহিনীর 'অহিংসা' ব্রত পূর্ণকাম হল যখন বেলজিয়ান জল্লাদের পিস্তল প্রার্থনারত ও নতজানু লুমুম্বাকে খুন করল পিছন থেকে গুলি করে।

'অহিংসা'-র একই সঙ্গে এত বড় একটা প্রহসন ও এত বড় একটা ট্রাজেডি পৃথিবীতে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। জাতিসংঘের পবিত্র নামে ও অহিংসার মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে আফ্রিকান মানবতার ও কঙ্গোলি জাতির বিরুদ্ধে এই যে একটা মহাপাপ আচরিত হল, এ পাপ শুধু বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের এবং তাঁদের বন্ধু ও মাতব্বর নেটো সাম্রাজ্যবাদীদের কেবল নয়, এ পাপ আমাদের সকলেরই। আমরা ভারতবাসীরাও এ পাপের অংশীদার। একথা সত্য যে, ভারতে প্রধান মন্ত্রী নেহরু থেকে আরম্ভ করে গ্রামের কৃষকরমণী পর্যন্ত সকলেই লুমুম্বার মৃত্যুতে ব্যথিত। আমরা আন্তরিক

ভাবে কঙ্গোর জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় অভ্যুদয় কামনা করি। কিন্তু এটা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের ভূতের ভয়ে আমরা ভারতবাসীরা কঙ্গোর দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারিনি। এখন অবশ্য আরো বেশী ভারতীয় সৈনিক কঙ্গোতে পাঠানো হচ্ছে এবং স্থির হয়েছে যে, জাতিসংঘ বাহিনী এখন থেকে জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য 'বলপ্রয়োগ' করবে। খুব ভাল কথা। কিন্তু কঙ্গোতে জাতিসংঘের উদ্দেশ্যটা যে ঠিক কি, এটা আজো পর্যন্ত কেউই বুঝে উঠতে পারে নি।

এইখানটাতেই বিশ্বশান্তি সংসদ পৃথিবীর জনমতকে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। জাতিসংঘ এখন থেকে 'বলপ্রয়োগ' করবে, শুধুমাত্র এই সরল ফরমুলাটাই যথেষ্ট নয়। বিশ্বশান্তি সংসদের মতে জাতিসংঘ বাহিনীর বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত: (১) শোম্বে, মোবুতু ও কালোনজির সশস্ত্র বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ; (২) অবিলম্বে কঙ্গো থেকে সমগ্র বেলজিয়ান সৈন্যের ও বেসামরিক কর্মচারীদের এবং উপনিবেশবাদীদের স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ; (৩) লুমুম্বার ও তাঁর সহকর্মীদের হত্যার জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তিবিধান। কঙ্গো সম্বন্ধে এই তিনটি দাবীই আজ পৃথিবীর জনসাধারণের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। যদি এই তিনটি দাবী জাতিসংঘ গ্রহণ না করে, তাহলে কঙ্গো থেকে সমগ্র জাতিসংঘবাহিনীর অপসারণ চাই, এই আহ্বানই এসেছে বিশ্বশান্তি সংসদের কাছ থেকে। জাতিসংঘ যদি কঙ্গোলি বিপ্লবের স্বপক্ষে কাজ না করে, তাহলে তার রূঢ় ও প্রতিক্রিয়াশীল হস্তক্ষেপ থেকে কঙ্গোকে মুক্ত করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক। যদি কঙ্গোলি দেশপ্রেমের জয়লাভের জন্য গৃহযুদ্ধই আবশ্যক হয় তাহলে কঙ্গোতে গৃহযুদ্ধ শতবার সহস্রবার কাম্য। কঙ্গোর স্বাধীনতা ও ঐক্যের বিরুদ্ধে বেলজিয়াম সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাঁদের নেটো মিত্রবর্গের ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করার জন্য ভারতের ও পৃথিবীর অন্যান্য শান্তিকামী রাষ্ট্রের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত গিজেঙ্গা সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো একান্ত আবশ্যক। ভারতে আমরা কঙ্গোর জন্য আর কিছু না করতে পারি, অন্ততঃ এই কলঙ্ক যেন ভারতের নামে না রটে যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কঙ্গোলি জাতির হত্যানুষ্ঠানে আজ্ঞাবহ জল্লাদের কাজ করেছে।

লাওস সম্বন্ধে বিশ্বশান্তি সংসদ দাবী জানিয়েছেন যে, লাওসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপকে রোধ করতে হবে, ফুমি-বাউন-আউন চক্রকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করতে হবে, লাওস থেকে সকল বিদেশী হস্তক্ষেপকারী সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীকে অপসারণ করতে হবে এবং লাওসে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫৪ সালের জেনীভা সম্মেলনকে পুনরায় আহ্বান করতে হবে অথবা তদনুরূপ একটি বড় রকমের সম্মেলন ডাকতে হবে। এই রকম একটি বড় সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব কয়েক মাস আগেই কাম্বোদিয়ার প্রধান মন্ত্রী করে আসছেন। সুখের বিষয় যে, এই প্রস্তাব শুধু ভারত নয়, আমেরিকা ও ব্রিটেনও গ্রহণ করেছে এবং এই প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ও চীনের যে সম্মতি আছে তা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে ব্রিটেনের ও আমেরিকার সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে তিন স্তরে লাওসে শান্তিপ্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন, যথা,—প্রথমে অগ্নিবিরতি, তারপর লাওস আন্তর্জাতিক কমিশনের পুনঃপ্রবর্তন এবং তৃতীয় স্তরে জেনীভা সম্মেলনের মতো একটি বড় সম্মেলনের আহ্বান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ও ব্রিটেন এই হুমকি দিচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি অবিলম্বে অগ্নিবিরতির প্রস্তাবে রাজী না হয় তাহলে সিয়াটো শক্তিবৃন্দ শান্তিরক্ষার জন্য লাওসে বিপুল আকারে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কেনেডি-ম্যাকমিলান হরিহরের এক মুখ থেকে বেরুচ্ছে শান্তির ললিত বাণী কিন্তু অন্য মুখ থেকে বেরুচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কার।

কেনেডির ও ম্যাকমিলানের এই আক্রমণাত্মক ও বিশ্বযুদ্ধের প্ররোচক লাওস নীতির সঙ্গে ভারতের জনগণ এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নামও যে সাম্রাজ্যবাদীরা জড়াতে চাইছেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। লাওসে প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেনেডি-ম্যাকমিলান-নেহরু শান্তি প্রস্তাবটি যদি সৎভাবে প্রযুক্ত হয়, তা হলে বিশ্বশান্তির পথে একটি মস্ত বড় ধাপ। লাওসে অবিলম্বে অগ্নিবিরতি অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নই লাওস আক্রমণ করেছে এবং সেই আক্রমণকে রোধ করার নামই লাওসীয় শান্তি ও লাওসীয় স্বাধীনতা, এটা যে একটা অতি বড় মিথ্যা কথা, তা ভারতে আমরা সকলেই জানি।

একথা সুবিদিত যে, আইজেনহাওয়ার আমলে উদ্ধত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ও তার থাইল্যাণ্ডীয় ও লাওসীয় তাঁবেদারদের নিরবিচ্ছিন্ন আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পারার ফলেই লাওসে যুবরাজ সুবন্ন ফুমার একান্ত নিরপেক্ষতাবাদী জাতীয় সরকারের পতন ঘটেছিল। আজ কেনেডি বোঝাতে চাইছেন যে, তিনি লাওসকে কমিউনিস্টদের হাতে যেতে দিতে পারেন না। খুব ভাল কথা। কিন্তু তাহলে সুবন্ন ফুমার সরকারটি আমেরিকার কর্তাদের মনে ধরল না কেন? ভারতের যে সকল সাংবাদিক সম্প্রতি লাওস বেড়িয়ে এসেছেন তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন যে, লাওসীয়েরা সত্যসত্যই শান্তিপ্রিয় জাতি এবং আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েরই সামরিক সাহায্যের বিষাক্ত প্রবাহ থেকে লাওসকে যদি মুক্ত করা হয়, তাহলে লাওসে সকল পক্ষই একটি সম্মিলিত জাতীয় সরকার স্থাপন করতে সম্মত হবে। এতে লাওসের বাইরে কারো কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না, অন্ততঃ আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট কেনেডি যদি সত্যসত্যই লাওসীয় জাতির স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা স্থাপিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ লাওসীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে তাঁর উচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চভের কাছে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা যে, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হোক এবং এই চুক্তি অনুসারে এই দুইটি রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট কালের মধ্যে নিজেদের সমস্ত বৈদেশিক ঘাঁটিকে অবলুপ্ত করবে এবং লাওস থেকে ও অন্যান্য সমস্ত বিদেশভূমি থেকে নিজেদের সৈন্যবাহিনীর ও অস্ত্রশস্ত্রের অপসারণ সাধিত করবে। বিশ্বশান্তি সংসদ পৃথিবীর জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ বার বছর ধরে অবিশ্রান্ত ভাবে এই দাবী জানিয়ে আসছেন এবং এবারে দিল্লীতেও জানিয়েছেন যে, প্রতিটি জাতির স্বাধীনতার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বিনা শর্তে মেনে নেওয়া চাই, সমস্ত বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটির অবসান চাই এবং সকল বিদেশী সৈন্যবাহিনীর অপসারণ চাই কেন না এই তিনটি ছাড়া বিশ্বশান্তি অসম্ভব।

আমেরিকার, ব্রিটেনের ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীরাই কোনোদিন এশিয়ার ও আফ্রিকার জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র স্থাপন করার অধিকার মানতে চান নি। এই সেদিনও তাঁরা

পৃথিবীর সকলের সামনে দাঁড়িয়ে জাতিসংঘের বৈঠকে নির্লজ্জভাবে ঔপনিবেশিক মুক্তিপ্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। ১৯৫৪ সালের জেনীভা চুক্তিকে প্রকাশ্যে অমান্য করে আইজেনহাওয়ার সরকার চাইলেন লাওসকে সিয়াটো জোটের মধ্যে টেনে আনতে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারে পরিণত করতে। এরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লাওসের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করেছে, সেই সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সাহায্য দিয়েছে, সেই সাহায্যও ঠাণ্ডা যুদ্ধের সামিল, এটা যারা মনে করেন তাঁরা ভ্রান্ত। তাঁরা ভুলে যান যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লাওসের দেশপ্রেমিকদের জয়লাভের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যই আমেরিকার লাওসীয় নীতিতে একটি গভীর সংকটের সৃষ্টি করেছে। কেনেডির লাওসীয় নীতিতে যেটুকু সুস্থ পরিবর্তন দেখা গিয়েছে, এই সংকটই তার কারণ। সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা প্রত্যেকটি শান্তিকামী জাতিরই কর্তব্য, সেই জাতি যতই নিরপেক্ষ হোক না কেন। সাম্রাজ্যবাদকে প্রতি পদে প্রতিহত না করে শান্তি আসতে পারে না। দুই শক্তি-জোটের বাইরে থাকার শুভ ইচ্ছার বশে ভারত যদি একথা ভুলে যায় যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই লাওসীয় স্বাধীনতার প্রধান ও নির্মম শত্রু, তাহলে একটা মস্ত বড় ভুল করা হবে।

লাওসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনমতকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিশ্বশান্তি সংসদ তাই শান্তির প্রতি বিশ্বস্ততারই পরিচয় দিয়েছেন। লাওসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপকে বন্ধ করার ব্যাপারে এবং সিয়াটো কর্তৃক লাওসে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বালানো নিবারণ করার ব্যাপারে ভারতের একটি বিরাট ভূমিকা আছে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ লাওস সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে ভারতের দিকে চেয়ে আছে। লাওসের জাতীয় স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রধান মন্ত্রী নেহরুর সমস্ত প্রচেষ্টা যে বিশ্বশান্তি সংসদের অটুট সমর্থন লাভ করবে এ বিষয়ে সন্দেহই থাকতে পারে না। লাওসে মার্কিন ঔপনিবেশিকদের ও সিয়াটো শক্তিবৃন্দের সমস্ত যুদ্ধচক্রান্তকে ব্যর্থ করে লাওস সমস্যা যে শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে এগিয়ে চলেছে, তার দ্বারা আর একবার প্রমাণিত হল যে, জাতীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তির শক্তি আজ যুদ্ধের শক্তিগুলির চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতাশালী।

আলজিরিয়ার স্বাধীনতার জন্য ফ্রান্সের ও আলজিরিয়ার মধ্যে আলাপ-আলোচনাকে বিশ্বশান্তি সংসদ স্বাগত জানিয়েছেন। সংসদ একটি প্রস্তাবে বলেছেন যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের নীতি নিষ্ঠুর এবং মানুষের মর্যাদার প্রতি অপমানস্বরূপ। এর প্রতিবাদে দক্ষিণ-আফ্রিকার পণ্য বর্জন করার নীতি সংসদের সমর্থন লাভ করেছে। সংসদ কেনিয়ায় জোমো কেনিয়াটার মুক্তি দাবী করেছেন। সংসদ ১৯শে জুলাই থেকে শুরু করে কিউবায় মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য একটি কিউবা সপ্তাহ উদযাপন করার ডাক দিয়েছেন। সংসদ পর্তুগাল কর্তৃক গোয়া, দমন ও দিউকে নিজের দখলে রাখার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং ভারতে পর্তুগালের ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের অবসানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক জনমতকে সংগঠিত করার জন্য বিশ্বের শান্তিকামী জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

সংসদ পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য এবং পারমাণবিক পরীক্ষা-মুক্ত অঞ্চল গঠনের জন্য পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সংসদের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, সামগ্রিক ও ষোলআনা নিরস্ত্রীকরণ ব্যতীত স্থায়ী বিশ্বশান্তি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সংসদ এ বিষয়ে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করার দাবী জানিয়েছেন এবং এই মত প্রকাশ করেছেন যে, নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় চীনের অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক। নিরস্ত্রীকরণই শান্তির চাবিকাঠি এবং মানবপ্রগতির মূল সূত্র। নিরস্ত্রীকরণই পৃথিবীর সমস্ত জাতির সমীকরণের ও বিশ্বমানবের ঐক্যের পথ। সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণ পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এমন এক বিশ্ববিপ্লব অনুষ্ঠিত করবে যার ভিতর দিয়ে আসবে রবীন্দ্রনাথের সেই মহামানব যাকে পাওয়ার জন্যই "রাত্রি-অন্ধকারে চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে, ঝড়ঝঞ্ঝা—বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি।" রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সহস্র সহস্র জনসভায় এই প্রতিজ্ঞা গৃহীত হোক যে, পৃথিবীর নিরস্ত্রীকরণের জন্য ভারতের জনগণ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে। সম্প্রতি কলিকাতায় বিশ্বশান্তি সংসদের নেতাদের সংবর্ধনার জন্য যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সভায় অধ্যাপক জে. ডি. বার্নাল বিশ্বশান্তি সংসদের পক্ষ থেকে এই কথা বলেছিলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ভারতের একটি নেতৃত্বমূলক ভূমিকা আছে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আশা করে যে, ভারত এই ভূমিকা পালন করে তার যুগযুগব্যাপী শান্তিসাধনাকে সার্থক করে তুলবে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্র পুরস্কার

মূল মহাভারতের সটিক ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদকর্মের জন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে এ বৎসরের রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক পুরস্কারগুলি নিয়ে আমাদের দেশে সাধারণভাবে যে দ্যূতক্রীড়া চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংবাদ আমাদের কাছে খুবই অভিনন্দনযোগ্য মনে হয়েছে।

আমাদের এই পাণ্ডিত্যাভিমানী, রম্য ও লোকভোলানো রচনায় বিলক্ষণ পারদর্শী, সংবাদপত্রের ক্রীতদাস (অথচ সুলেখক এবং সুপণ্ডিত এবং সু-অধ্যাপক ও সু-গবেষক) ভাঁড়ের দেশে এই মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত তুলনা রহিত।

বিগত কুড়ি বছর নিরলস শ্রম, অপরিসীম অধ্যবসায় ও অসামান্য প্রজ্ঞার বলে সম্পূর্ণ একক ও নিঃসঙ্গ প্রয়াসে এই চুরাশী বছরের বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় প্রায় দুঃসাধ্য ব্রতে সাফল্য অর্জন করেছেন। এতদ্দেশীয় সারস্বতসাধনার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

বেদব্যাসকৃত মূল মহাভারতের পাঠান্তরসহ প্রতি শ্লোক, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন 'ভারতভাবদীপ টীকা' এবং স্বকৃত 'ভারতকৌমুদী টীকা' সম্বলিত এই অনুবাদকর্মে একাধারে প্রজ্ঞা ও রসবোধের পার্বতী পরমেশ্বরের মিলন ঘটেছে।

মহামহোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় বারোটি মৌলিক কাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। তাছাড়া মালবিকাগ্নিমিত্র, উত্তররামচরিত, মালতীমাধব, দশকুমারচরিত, মৃচ্ছকটিক, রঘুবংশ, শকুন্তলা, শিশুপালবধ, নৈষধ ও মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি প্রখ্যাত কাব্য, মহাকাব্য ও নাটকের টীকা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্রপুরস্কার সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে প্রদান করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের পক্ষে প্রায় আশাতীত সুবিবেচনার পরিচয় দান করেছেন।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দকে তাঁর ইংরেজী ভাষায় রচিত 'হিস্টোরিকাল ডেভেলপমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ান মিউজিক' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার প্রদত্ত হওয়ার সংবাদেও আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর পারদর্শিতা প্রশ্নাতীত। বিশেষত সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ে রচিত তাঁর একাধিক গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রায় আকরগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বর্তমানে কলকাতার বেদান্ত মঠের সম্পাদক। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁর জীবনের প্রধান সাধনাই সংস্কৃতি-অভিমুখী। দুই খণ্ডে 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', 'রাগ ও রূপ', 'বাঙলা ধ্রুপদমালা', 'সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ', সঙ্কলন গ্রন্থ 'সঙ্গীত সার সংগ্রহ' প্রভৃতি পুস্তক ও বহুবিধ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই সে সত্যের অভ্রান্ত নিদর্শন।

আকাদেমির পুরস্কার

এবার বাংলা সাহিত্য কেন্দ্রীয় আকাদেমি পুরস্কার পায় নি। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা এ কারণে সঙ্গত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এমতাবস্থায় হুমায়ুন কবীর সাহেবের একটি বিবৃতি অনেককে বিমূঢ় করেছে, এবং হয়তো সেই বিবৃতিতে অনেক সূক্ষ্ম রহস্যের ইঙ্গিতও উঁকি মেরেছে। কবীরসাহেব বলেছেন বাংলাদেশে এত ভালো বই লেখা হয় যে কোনটা ছেড়ে কোনটাকে পুরস্কৃত করবেন—তা তাঁরা ঠিক করে উঠতে পারেন নি।

সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের কাছে নিছক বাঙ্গালী-বিদ্বেষের উদাহরণ নয়, একথা বলা দরকার। সাহিত্য ও শিল্প বিচারে মূলগত ত্রুটি এবং সঙ্কীর্ণ চিন্তা থেকে যাচ্ছে। তার সঙ্গে প্রাদেশিক মনোভাব অনেক সময় যুক্ত হয়।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যখন একটি তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দি ছবি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায় এবং 'দেবী' ও 'গঙ্গা' বিচারকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ না হওয়ার কারণে যখন আমরা দিল্লীওয়ালাদের ওপর ক্রুদ্ধ হই, তখন ভুলে যাই আমাদের বিচারকরাই 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মতো একটি নিম্নস্তরের ছবিকে সুপারিশ করে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন এবং 'মেঘে ঢাকা তারা'র কথা তাঁদের মনেও থাকে নি। আর তাঁদের বিচারের ক্রমে 'গঙ্গা'র আগে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর স্থান ছিল।

সামগ্রিকভাবে এই বিচার বিভ্রাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলা দরকার। দিল্লী এবং কলকাতার আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণ যে ধিক্কার জানাচ্ছে, 'পরিচয়' তার সঙ্গে আপন কণ্ঠ মিলিত করল।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাঙ্গেরির চলচ্চিত্র উৎসব

ক্যালকাটা ফিল্ম্ সোসাইটি সম্প্রতি কলকাতায় হাঙ্গেরির কতকগুলি সুন্দর চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছিলেন ভারতস্থিত হাঙ্গেরীয় দূতাবাস এবং নিখিল-ভারত ফেডারেশন অফ ফিল্ম্ সোসাইটিস। এই হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্র উৎসবের ব্যবস্থা করার জন্যে চলচ্চিত্রামোদী মাত্রেই ক্যালকাটা ফিল্ম্ সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানাবেন। ইতিপূর্বে সুইডিশ চলচ্চিত্র উৎসবের ব্যবস্থা করে তাঁরা চলচ্চিত্ররসিকদের সাধুবাদ পেয়েছেন।

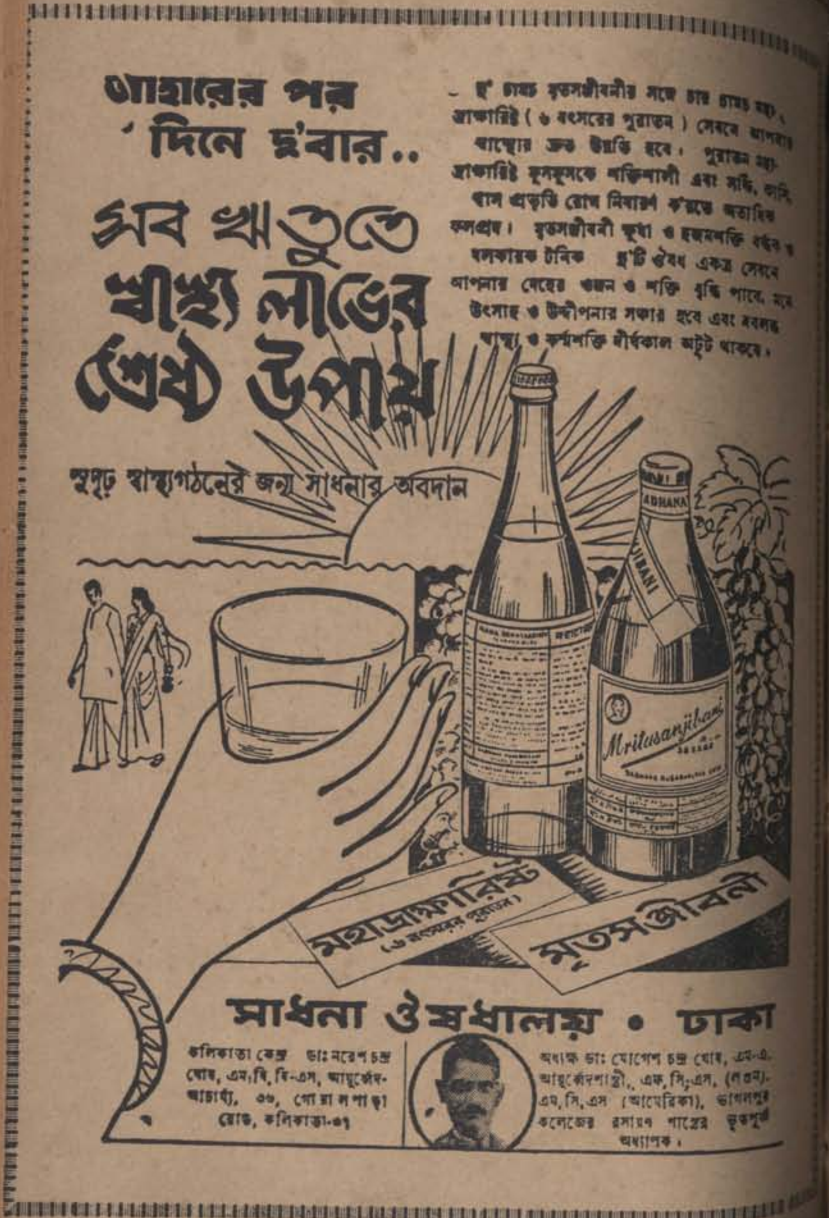
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যেসব দেশ চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে, তাদের মধ্যে হাঙ্গেরি অন্যতম। এতদিন পর্যন্ত আমরা যেসব খ্যাতনামা হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্রশিল্পীর কথা জানতাম—যেমন: আলেকজাণ্ডার কোর্ডা, মাইকেল কার্টিস কিংবা চার্ল্‌স্ ভিডর—তাঁরা আমাদের কাছে পরিচিত ব্রিটিশ কিংবা হলিউডী ছবির মারফতে। নতুন হাঙ্গেরির এই চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে আমরা এই প্রথম

তরুণ পরিচালক কারোলি মাক, ভিক্‌টর গেট্‌লের, লাজ্‌লো রানোভি প্রমুখের নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হলাম। ইতিপূর্বে একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে হাঙ্গেরির বিভিন্ন ছবির পুরস্কার পাওয়ার খবর আমরা পেয়ে থাকলেও, কলকাতায় পর পর পাঁচটি সাম্প্রতিক হাঙ্গেরীয় ছবি দেখার সুযোগ এই আমরা প্রথম পেলাম এবং নতুন হাঙ্গেরির চলচ্চিত্র-পরিচালকদের, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এবং কারু-কুশলীদের শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম।

পাঁচদিন ব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম দিনে প্রদর্শিত 'হাউস আণ্ডার দি রক্‌স' এবং শেষ দিনের 'বি গুড আন্‌টিল ডেথ' ছবি দুটি নিঃসন্দেহে হাঙ্গেরির প্রতিনিধিস্থানীয় ছবি—যদিও সব ক'টি ছবিই সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ, বক্তব্যের সুস্থতায় আর জীবনের বাস্তবতার প্রকাশে রসোত্তীর্ণ। ১৯৫৮ সালে সানফ্রান্‌সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে পুরস্কার পাওয়া প্রথম ফিল্‌মটির বিষয়বস্তু হল হাঙ্গেরির বাদাক্‌সোনি পার্বত্য অঞ্চলের কৃষকদের জীবন ও আশা-আকাংক্ষা-সংগ্রাম। এই পটভূমিতে গাঁথা হয়েছে একটি হৃদয়গ্রাহী গল্প—যার রচয়িতা হলেন বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় লেখক সেণ্ডর টার্দি। এক-একটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে যে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবেশগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে, তা পরিচালক কারোলি মানের ও ক্যামেরাম্যানের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। একটা ছবি দেখে কোনো একজন পরিচালকের বিশিষ্ট স্টাইল সম্পর্কে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা না গেলেও, অন্তত এই ছবিটির প্রাকৃতিক পরিবেশ, সম্পূর্ণ নিরাভরণ সেটিং আর কড়াকড়ি রকমের বাস্তবানুগতা অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত নিও-রিয়ালিস্টিক ইটালিয়ান ফিল্‌মের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা শুধুই ট্রিটমেণ্টের দিক থেকে।

শেষ দিনে প্রদর্শিত লাজ্‌লো রানোভি-পরিচালিত 'বি গুড আন্‌টিল ডেথ' ছবিটি হল আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ জিগ্‌মণ্ড মরিস-এর সুবিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপ। ইংরেজি অনুবাদে এই উপন্যাসটি পড়ার সুযোগ যাঁদের হয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে এই ফিল্মটির চিত্রনাট্যে কত বিশ্বস্ততার সঙ্গে মূল উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসকে অনুসরণ করা হয়েছে, অথচ সেই সঙ্গে সিনেমার নিজস্ব শিল্প-আঙ্গিকে গল্প বলার পদ্ধতিটিকেও পুরোপুরি মেনে চলা হয়েছে। এই ছবিটিতে কিশোর অভিনেতাদের অভিনয় অবিস্মরণীয়। সমান স্মরণীয় 'রেড ইঙ্ক' (পরিচালক ভিক্‌টর গেট্‌লের) ছবিটিতে একজন কিশোরী অভিনেত্রীর ভাবাভিব্যক্তি। অভিনয়ের মান সব ছবিতেই যেমন উন্নত তেমনি আঙ্গিকগত কারুকৌশলও সুপ্রযুক্ত।

রবীন্দ্র মজুমদার



পরিচয়

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা

বৈশাখ । ১৩৬৮

